দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ * ১৬ তম সংখ্যা * ৪ নভেম্বর ২০২৪

এই সংখ্যায় থাকছে

- কাশ্মীরের রায়- 'ভয়ের রাজ্যে থাকব না' ২
- হরিয়ানার নির্বাচনে পরিচালন দক্ষতায় বিজেপির জয় ৫
- অভয়ার হত্যা প্রশাসনিক মদতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক খুন ৬
- মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক ঃ যে সত্য উদঘাটিত হল ৮
- পথে প্রান্তরে : ডান্ডির চটকল শ্রমিক ও স্কটল্যান্ডে দীপাবলি ৯
- হাসিনার দুঃশাসনের মাপকাঠিতে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করা ঠিক হবে না ১১
- ৩১ অক্টোবর : ইন্দিরা গান্ধীর শহীদত্ব বরণের দিন স্মরণে ১২
- মধ্যপ্রাচ্য : শান্তির সন্ধানে ১৪
- শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থীদের জয় ১৫
- ইতিহাসের অনাচার : সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন ১৭
- ভিয়েতনামের ডায়েরি ১৯
- জি এন সাইবাবার মৃত্যু কি এক পরিকল্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা? ২৬
- বাংলার ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি লাভ প্রসঙ্গে কিছু কথা ২৭
- স্মরণ : রতন টাটা (১৯৩৭-২০২৪) ২৯
- জামশেদজী টাটার নাতি ছিলেন ব্রিটেনের প্রথম কমিউনিষ্ট এম. পি. ৩০

সম্পাদকীয়

প্রধান বিচারপতির অন্ধ বিশ্বাস

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড় আগামী ১১ নভেম্বর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। তিনি ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন এবং প্রধান বিচারপতি হন ২০২২ সালের নভেম্বরে। তিনি সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে তাঁর পৈতৃক গ্রামে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেন , তাঁর কর্মজীবনে তাঁকে অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু রায় দিতে হয়। যেমন বাবরি মসজিদ ও রাম জন্মভূমি বিতর্ক সংক্রান্ত রায়। তিনি ছিলেন ওই বিতর্ক বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চের সদস্য। শ্রী চন্দ্রচূড় বলেন তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে স্বয়ং ঈশ্বর এসে ওই মামলার রায় কী হবে তা বলে দেন। শ্রী চন্দ্রচূড় অবসর গ্রহণের ও মহারাষ্ট্র বিধান সভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের কথা কেনো বললেন? তিনি তাঁর বাড়িতে শ্রী গণেশ পূজায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকেও আমন্ত্রণ করেছিলেন। কেনো ?

এই ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা আমরা পূর্বে আর একজন প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে শুনেছিলাম। সেই বিচারক ছিলেন, পি.এন.ভগবতী। তিনি দাবি করেছিলেন যখনই তিনি কাগজ ও পেন নিয়ে বিচারের রায় লিখতে বসতেন তাঁর ভগবান শ্রী সত্য সাই বাবা এসে রায় লিখে দিতেন। এই দুই বিশিষ্ট বিচারপতি তাঁদের ব্যক্তিগত অন্ধ বিশ্বাস কে তাঁদের উৎকৃষ্ট বিচারের ভিত্তি বলে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।

রামচন্দ্রের জন্মস্থানের ওপর বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, ক্রমাগত এই মিথ্যা প্রচার অবশেষে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে Archaeological Survey of India এরকম কোনো প্রমাণ পায় নি। বিপরীতে এই তথ্য ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তি তুলে ধরতে পারেনি।

গত ৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাবরি মসজিদ - রামজন্ম ভূমি সংক্রান্ত বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এর নেতৃত্বাধীন ৫ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ তাঁদের 'বিরল' রায়ে অযোধ্যায় বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমি 'রামলালা বিরাজমান', বিগ্রহের বলে রায় দিয়েছেন। এই রায় দেওয়া হয়েছে যুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে। এই সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচুর । আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন মহান ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এই রকম রায় দেওয়া হয়। মনে হয় সেই জন্যই সুপ্রিম কোর্ট এই বিতর্কে যে রায় দেয় তাতে বিচারকরা সই করেন নি। সই করবেন স্বয়ং ঈশ্বর।

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

কাশ্মীরের রায়- 'ভয়ের রাজ্যে থাকব না'

শুভ প্রসাদ নন্দী মজুমদার

একদিকে রাষ্ট্রীয় হিংসা ও অপরদিকে সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে আসা হিংসায় দশকের পর দশক ধরে জর্জরিত কাশ্মীরের মানুষ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে এখন শান্তি, স্বস্তি চায়, সর্বোপরি চায় আত্মমর্যাদা ও হৃত অধিকারের পুনরুদ্ধার। যে কাশ্মীরের জনগণ ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকে নির্বাচন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত, তারাই এবারে দলে দলে ভিড় করেছিল ভোট কেন্দ্রগুলিতে। শুধু ভোটদানের হার নয়, বিজয়ী জোটের প্রতি সমর্থনের ঢলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের সুস্পষ্ট রায় ব্যক্ত হয়েছে।সাধারণ ভাবে বললে, এই নির্বাচনের মূল বিষয় ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ মর্যাদা পুনরুদ্ধার। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত ৯ আগস্ট সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা হরণ করে রাজ্যের বিভাজনের মাধ্যমে দু'টি কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের জন্ম দেয়।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে। চারজন নির্দলীয় বিজয়ী বিধায়কের সমর্থন যোগ করার পর ৯০ সদস্যের বিধানসভায় ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস, সিপিআইএমকে নিয়ে গঠিত ইন্ডিয়া মঞ্চের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩-এ। কাশ্মীর উপত্যকার কুলগাম আসনে টানা চারবারের নির্বাচিত সিপিআইএম বিধায়ক মহম্মদ ইউসুফ তারিগামী পঞ্চমবার বিজয় অর্জন করেছেন। এই জয়ের এই ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র নির্বাচনী জোটের প্রতিফলন নয়। কাশ্মীরের রাজনীতিতে সিপিআইএম দলের স্বাধীন শক্তি বৃদ্ধিরও ইঙ্গিত বহন করে।কংগ্রেস পেয়েছে ছয় (৬) টি আসন। জোটের এই বিপুল সংখ্যক আসনে জয়ের পরও এই জয়কে রাজ্যের মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থন বলা যাচ্ছেনা। না। এখানেই লুকিয়ে আছে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। রাজ্যের দু'টি অংশে নির্বাচনের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। ইন্ডিয়া জোট বিপুল জয় পেয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়। কিন্তু জম্মু অংশে একইভাবে জয় পেয়েছে বিজেপি। বিজেপির বরাবরের বিভাজনের রাজনীতি হল জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে দু'টি মেরুতে ঠেলে দেওয়া। কাশ্মীর ও জম্মুকে মুসলিম ও হিন্দু পরিচিতিতে দেগে দিয়ে দু'টি অংশকে সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় লাগিয়ে দেওয়া সঙ্ঘ পরিবারের পুরনো রাজনীতি। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার বিভাজনের এই পুরনো রাজনীতিকে আরও কদর্য চেহারা দিতে একের পর এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও আইনী পরিবর্তন এনেছিল। বিজেপি নেতাদের বক্তৃতায় এবং আইটি সেলের বন্যার মত পোস্টে 'এবার কাশ্মীরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী' শিরোনামে নাগাড়ে প্রচার হয়েছে ভোট ঘোষণার পর থেকে। মূলত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। হিন্দু ভোটদাতাদের দিকে ভারসাম্য থাকা আসনের সংখ্যা বাড়াতে বিধানসভার আসনগুলির সীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে বিধানসভার আসনের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে আসামেও। উদ্দেশ্য অভিন্ন, মুসলিম ভোটদাতাদের প্রভাব খর্ব করা। এই প্রক্রিয়ায় জম্মুতে আসন বৃদ্ধি হয়েছে তিনটি আর কাশ্মীর উপত্যকায় মাত্র একটি। এমনকী লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পাঁচজন সদস্য মনোনীত করার। বলা বাহুল্য, এটা ঘুরপথে বিজেপি বিধায়কের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি অপকৌশল। এর লক্ষ্য ছিল বিজেপি প্রার্থীকে মুখ্যমন্ত্রী করার ক্ষেত্রে আসন সংখ্যার ঘাটতি থাকলে সেটা মনোনীত সদস্য দিয়ে পুষিয়ে দেওয়া। বিজেপির লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। এক, জম্মুতে নিজেদের আসন সংখ্যা সর্বাধিক করা। দুই, কাশ্মীর উপত্যকায় বিভিন্ন চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে প্রচ্ছন্নে প্রশ্রয় দিয়ে একাধিক প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ভোট বিভাজনের মাধ্যমে ইন্ডিয়া জোটের আসন সর্বনিম্ন করা। এই কাজকে রূপ দিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী চরমপন্থী ইনিজিনিয়ার রশিদ নামে খ্যাত লোকসভা সদস্যকে নির্বাচনের আগে জেল থেকে পেরোলে মুক্তি দেওয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হলেও তখন তাকে নিজের নির্বাচনী প্রচারের জন্যে মুক্তি দেওয়া হয় নি। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের সংগঠন জামাতে ইসলামীর সাথে জোট বেঁধে ইনিজিনিয়ার রশিদের দল আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টি প্রার্থী দিয়েছিল। নির্বাচনী প্রচারে এই জোটের মূল আক্রমণ কেন্দ্রীভূত ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরুদ্ধে। বিজেপির ধারণা হয়েছিল যে তাদের দু'টি ছক সফল হলেই বাকিটা লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোনীত সদস্যদের নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হয়ে যাবে। পুরো ভাবনাটিই ছিল এক ধরনের সংখ্যাগুরুবাদী হিন্দুত্বের দম্ভ। নির্বাচনী ফলাফল বিজেপির মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে জম্মুতে বিপুল বিজয় হাসিল করলেও কাশ্মীর উপত্যকায় তারা ভোট পেয়েছে সাকুল্যে ২.২ শতাংশ। যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলিকে তারা পেছন থেকে মদত দিয়েছিল ভোটে তাদের ফলাফল হয়েছে শোচনীয়। বিচ্ছিন্নতাকামী সব সংগঠনই পর্যুদস্ত হয়েছে। এমনকী আফজল গুরুর ভাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুশোটি ভোটও পায় নি। বিজেপি বা সঙ্ঘ পরিবার কাশ্মীরের জনগনকে যতই পাকিস্তানপন্থী ও বিচ্ছিন্নতাকামী বলে প্রচার করুক, এই নির্বাচনের ফল প্রমাণ করে দিয়েছে কাশ্মীরের মানুষ জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। একদিকে রাষ্ট্রীয় হিংসা ও অপরদিকে সন্ত্রাসবাদীদের তরফ থেকে আসা হিংসায় দশকের পর দশক ধরে জর্জরিত কাশ্মীরের মানুষ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে এখন শান্তি, স্বস্তি চায়, সর্বোপরি চায় আত্মমর্যাদা

ও হৃত অধিকারের পুনরুদ্ধার। যে কাশ্মীরের জনগণ ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকে নির্বাচন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত, তারাই এবারে দলে দলে ভিড় করেছিল ভোট কেন্দ্রগুলিতে। শুধু ভোটদানের হার নয়, বিজয়ী জোটের প্রতি সমর্থনের ঢলের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের সুস্পষ্ট রায় ব্যক্ত হয়েছে।সাধারণ ভাবে বললে, এই নির্বাচনের মূল বিষয় ছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ মর্যাদা পুনরুদ্ধার। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত ৯ আগস্ট সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা হরণ করে রাজ্যের বিভাজনের মাধ্যমে দু'টি কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের জন্ম দেয়। স্বাধীন ভারতে পূর্ণ রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবনমনের দ্বিতীয় আর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিজয় অর্জন করলেও ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোটের সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দাঁড়াবে জম্মু অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে কীভাবে রাজ্যের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করবে। এই আশঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সরকারের পথচলা শুরু হবে।

এই অনিশ্চয়তা বা আশঙ্কা সত্ত্বেও এই ফলাফলের আরও বড় তাৎপর্য রয়েছে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত থেকে একে বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের বিজয় হিসেবে দেখলে ফলাফলের তাৎপর্যকে শুধুমাত্র সংকীর্ণ অর্থে দেখা নয়, সামগ্রিক বাস্তবতা থেকে দূরে থাকা হবে। স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রের সব সরকারই কাশ্মীরের বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে। সেখানকার ইতিহাস, সমাজ, জনগন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম, বঞ্চনা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণকে অনবহিত রেখেছে। আরএসএস, জনসঙ্ঘ ও তার উত্তরসূরী বিজেপির রাজনীতি বরাবর থেকেছে কাশ্মীরের ইতিহাসের বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগনকে অবশিষ্ট ভারতের জনগনের কাছে হেয় করা। কাশ্মীরের মানুষের কংগ্রেস দলও বারবার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। কেন জম্মু ও কাশ্মীর দেশের আর দশটি রাজ্যের চেয়ে আলাদা, কেন জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে এতদিন, সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করার কারণ কী, এ সম্পর্কে ভারতের সাধারণ মানুষ শুধু নয়, রাজনীতি সচেতন বলে পরিচিত মানুষের বেশিরভাগ অংশেরই কোনো ধারণা নেই। আরএসএস বা বিজেপি একে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি কংগ্রেস সরকারের অন্যায় পক্ষপাত হিসেবে প্রচার করে এটাকে মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতির সাথে যুক্ত করে। ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তিও জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে পারে নি।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সেই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এটা সকলেরই জানা যে ভারতের সমস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশ - বাদের সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সাড়ে পাঁচশোর বেশি রাজন্য শাসিত অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ আশ্রিত কিন্তু সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নয়। ভারতের প্রায় দুই পঞ্চমাংশ অঞ্চল জুড়ে ছিল এই রাজন্য শাসিত অঞ্চল যাকে বলা হত দেশীয় রাজ্য। সরাসরি ব্রিটিশ শাসন না থাকায় বরোদা ও মহীশূর ছাড়া বাকি দেশীয় রাজ্যগুলিতে আধুনিক শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ছিল প্রায় অবরুদ্ধ। শাসন ব্যবস্থার সংস্কার বা শিক্ষা বিস্তারের কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ ছিল সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চলের মত। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজবংশ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী ডোগরা শাসকেরা, আর রাজ্যের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরেরা ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। ডোগরা রাজ পরিবার ও তাদের অমাত্যরা ছিল প্রবল অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শোষক এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী। নানা অছিলায় গরিব কৃষক ও কারিগরদের উপর চড়া হারে কর আরোপ করত। রাজা ও অমাত্যদের জীবন ছিল বিলাস আর বৈভবে ভরা, আর প্রজারা ছিল চরম অভাব ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মতপ্রকাশের একটি মাধ্যমের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও বেশিরভাগ দেশীয় রাজ্যে ১৯২০-র আগে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয় নি। ১৯৩১ সালে কাশ্মীরের মহারাজার শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের জনগন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজ প্রশাসন গুলি চালিয়ে ২২ জন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে এর প্রত্যুত্তর দেয়। দরিদ্র প্রজাদের সিংহভাগ ছিল মুসলিম। হিন্দুরা ছিল মূলত ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারী। ফলে এই অসন্তোষ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেখা দেয়। বিক্ষোভ প্রশমন ও হিংসা রোধের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হলে মহারাজা বাধ্য হয় গ্লান্স কমিশন নামে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রজা সভা নামে একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা গঠন করে রাজ প্রশাসন। এই আন্দোলন থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগনের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন শেখ আবদুল্লাহ। ১৯৩২ সালে গঠিত হয় তাঁর নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স নামে প্রথম রাজনৈতিক দল। তাঁদের আন্দোলন ও সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র দিতে ১৯৩৯ সালে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স। তাদের স্বাধীনতার লড়াই ছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

প্রধান দাবি ছিল আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার। সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দলের পতাকা হিসেবে তারা বেছে নেন লাল নিশানকে। দলের প্রধান দাবি 'লাঙল যার জমি তার'কে লক্ষ্য রেখে লাল নিশানে অঙ্কিত হয় সাদা রঙে লাঙলের ছবি। এখনও ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকা লাঙল শোভিত লাল নিশান। প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁরা স্থির করেন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ থেকে সমদূরত্বের নীতি। দলের এই চরিত্র পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট হয়ে একটি অংশ পুরনো সংগঠন মুসলিম কনফারেন্সকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং মুসলিম লিগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স মৈত্রীবদ্ধ হয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সামনে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান অথবা স্বাধীন থাকার প্রস্তাব রেখেছিল। কাশ্মীরের মহারাজা চেয়েছিলেন স্বাধীন কাশ্মীর। মুসলিম কনফারেন্স চেয়েছিল পাকিস্তান সংযুক্তি। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে শেখ আবদুল্লাহ চেয়েছিলেন ভারতের সাথে সংযুক্তি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ২২ অক্টোবর কাশ্মীর ছিল স্বাধীন। পাকিস্তানী হানাদারদের আক্রমণের মুখে মহারাজা ভারতের সাথে সংযুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ দপ্তর কেন্দ্রের অধীনে রেখে অবশিষ্ট বিষয় রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে থাকার শর্তের বিনিময়ে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীর উচ্ছেদ ও আমূল ভূমি সংস্কারের মত ন্যাশনাল কনফারেন্সের দীর্ঘ বছরের আন্দোলনের বিষয়গুলির সুনিশ্চয়তার জন্যে সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করা হয়। আরেকটি বিষয় কাশ্মীরের আলোচনায় অনুল্লিখিত থাকে। দেশভাগের সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের দাঙ্গার প্রত্যুত্তরে কাশ্মীরের মহারাজের সাথে যোগসাজশে আরএসএস তাদের অঙ্গ সংগঠন জম্মু প্রজা পরিষদের মাধ্যমে জম্মুতে নৃশংস সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা চালায়। অসংখ্য নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করা হয় ও জম্মুর স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণের সংখ্যাধিক্য অংশকে জম্মু অঞ্চল থেকে উৎখাত করা হয়। এই উৎখাত অভিযান ও সমান্তরালে পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের বসতি প্রদানের মাধ্যমে জম্মু অঞ্চলের জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন করা হয়। এভাবেই জম্মু ও কাশ্মীরকে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম অঞ্চলে পরিবর্তিত করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকার ধীরে ধীরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ও অধিকারের দিকগুলিকে ক্রমান্বয়ে খর্ব করে। কাশ্মীরের মানুষের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ বিক্ষোভের উত্তর দেওয়া হয়েছে সীমাহীন সামরিক বর্বর নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে। যে কাশ্মীরের জনগন পাকিস্তানের হানাদারদের রুখে দিয়ে ভারতের সাথে সংযুক্তির পথে ভারতীয় সেনাকে সম্বর্ধিত করেছিল কাশ্মীরের মাটিতে একটা সময়ে, তারা কেন একটা সময়ের পর ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিল এই প্রশ্নের উত্তর প্রাথমিকভাবে ভারত সরকারকেই দিতে হবে। ভারত সরকারের নিষ্ঠুর দমনপীড়নে অতীষ্ঠ হয়েই সেখানে জঙ্গিবাদ জন্ম নিয়েছে। দাবি উঠেছে স্বাধীনতার বা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তির। অথচ এই দুটি বিকল্পের সচেতন প্রত্যাখানের মধ্য দিয়েই কাশ্মীরের জনগন ভারতে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিল। কাশ্মীরের আত্মমর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের দাবিতে করা ন্যাশনাল কনফারেন্সের আন্দোলনকে রুখে দিতে ভারতের শাসকশ্রেণি বারবার হাত মিলিয়েছে বিচ্ছিন্নতাকামী ভারত বিরোধী শক্তির সাথে। একটা সময়ে ১৯৫৩ পূর্ববর্তী পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার ছিল কাশ্মীরের জনগনের প্রধান দাবি। আজ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা হারানো কাশ্মীরের জনগনের প্রধান দাবি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদার পুনরুদ্ধার। বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার তরুণ খুন হয়েছে কাশ্মীরে, লক্ষাধিক যুবক চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। গোটা কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে অসনাক্ত তরুণের কবর। সারা রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক ও ত্রাসের এক অভূতপূর্ব রাজত্ব বিরাজ করছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কাশ্মীরের জনগনকে মানবেতর জীবনে নিক্ষেপ করে কিছু চোখ ধাঁধানো নির্মাণকার্যকে প্রদর্শন করে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চাইছে বাইরে। আর ভেতরে চাইছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কাশ্মীরের আত্মপরিচয়কে মুছে দিতে। এই নির্বাচনে বিপুল উৎসাহে যোগদান ও সুনির্দিষ্টভাবে মতাভিমত প্রদানের মাধ্যমে আসলে কাশ্মীরের জনগন প্রকৃতপক্ষে ভয়ের রাজ্য থেকে মুক্তি চাইছে। মুক্তি চাইছে অপমান, অসম্মান ও অধিকারহীনতা থেকে। বিচ্ছিন্নতাকামী চরমপন্থীদের সমর্থক রাজনৈতিক শক্তির বিপুল প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের পক্ষপাত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে ভারতের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ধারণার পক্ষে। কাশ্মীরের মানুষের এই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা তখনই পরিপূর্ণ হবে যখন জম্মুর মাটিতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে প্রতিরোধ করে পরিপূরক গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে পারবে নতুন সরকার।

'মার্কসবাদী পথ' এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

হরিয়ানার নির্বাচনে পরিচালন দক্ষতায় বিজেপির জয়

অমিতাভ সিংহ

ভোট ফেরৎ সমীক্ষাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে হরিয়ানা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করল। প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা, কৃষকের ওপর অত্যাচার, রাজ্যের কুস্তিগির বিনেশ ফোগত সহ মহিলা কুস্তিগীরদের লাঞ্ছনা ও গত দশ বছরে রাজ্য চালনায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই জয় প্রমাণ করল দেশে ধর্ম ও জাতপাতের রাজনীতি এখনও ভোটের বা ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। সব সমীক্ষাকে পেছনে ফেলে বিজেপি'র এই জয় নিঃসন্দেহে তাঁদের নতুন করে অক্সিজেন জোগাবে। এই জয়ে আরএসএস -এর ভূমিকাকে ছোট না করেও বলা যায় কংগ্রেসের রাজ্য নেতাদের অনবরত জাতপাত কেন্দ্রিক কলহের জন্যও হরিয়ানার এই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হল। এটা ঠিক যে ভোটের ফারাক মাত্র ০.০৮ শতাংশ অর্থাৎ এক শতাংশেরও কম। কিন্তু এত কম ভোটের হার সত্ত্বেও বিজেপি ১১ টি আসন বেশী পেয়েছে কংগ্রেসের চেয়ে, এমনকি গতবারের ৪০ টির চেয়েও বেশী পেয়েছে ৮ টি আসন। আপ ২ শতাংশের চেয়েও কম ভোট পেয়ে মুছে গেলেও একটা সত্য স্বীকার করতে হবে কংগ্রেস, আপ, সমাজবাদী দলের জোট হলে হরিয়ানায় কংগ্রেসের বা বিরোধীদের আসন বাড়ত, হয়তো রাজ্যেও সরকার গড়তে পারত। রাহুল গান্ধী তো তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহ হুডা, যিনি একসময় বিক্ষুব্ধ নেতাদের জি-২৩ গোষ্ঠীর একজন ছিলেন, তিনি দলের ক্ষতি হবে বলে ও নিজে একাই একশ ধরনের ভাব দেখিয়ে জোট করতে বাধা দেন। আর রাহুল যেহেতু রাজ্য নেতাদের গুরুত্ব দেন তাই নিজে জোর দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত চাপাতে যান নি। একজন বর্ষীয়ান নেতার যদি সকলকে নিয়ে চলার ক্ষমতা না থাকে বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা না থাকে তাহলে কোনও নির্বাচনেই প্রার্থিত ফল পাওয়ার আশা না করাই ভাল। তিনি অশোক গেহলট, ভূপেশ বাঘেল বা কমলনাথদের উদাহরণ জু দেখেও শিখলেন না। ৭২বছর বয়সেও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার বাসনা দলের বা সার্বিক বিরোধীদের কতটা ক্ষতি করল তার মূল্যায়ন আগামীদিনে নিশ্চয়ই করা হবে। ১৯৮৫ সালের রাজীব গান্ধী বোম্বেতে কংগ্রেস শতবার্ষিকীতে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন দল থেকে ক্ষমতার দালালদের তাড়াতে হবে। সেটা যে হয়নি তার প্রমাণ তো পাওয়া গেল।

এরপর আরেকটা ভুল করা হল,নির্বাচনের সমস্ত কতৃত্ব ও দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হল জাঠ নেতা ভুপেন্দ্র সিংহ হুডার কাঁধে। ৯০ টার মধ্যে ৭২ টি প্রার্থী ঠিক করলেন হুডা একেবারে নিজের অনুগামীদের টিকিট দিয়ে। ফলে দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজা এবং রনদীপ সিং সুর্যেওয়ালা বা বীরেন্দ্র সিং এর মতো প্রভাবশালী নেতা নেত্রীরা সেভাবে প্রচারে নামলেনই না বা তাদের নামতে দেওয়া হল না। হাইকম্যান্ডও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আর হস্তক্ষেপ করলেন না। কারণ এই হুডাই দুদশক ধরে এইরাজ্যে দলকে সামলেছেন। একথাও জানা গেল যে এই রাজ্যে নাকি জেলা বা ব্লক সভাপতি ছাড়াই চলছে কংগ্রেসের সংগঠন। প্রশ্ন উঠেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দলের যে সম্পাদক বা পর্যবেক্ষক কে রাজ্যের জন্য নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা গত পাঁচ বছর ধরে কি এই বিষয়গুলি দেখেন নি ?

গত কয়েক বছর হুডার সঙ্গে বিরোধে বহু নেতা দল ছেড়েছেন।এর মধ্যে রাহুলের বিশ্বাসভাজন যুবনেতা অশোক তানওয়ারও ছিলেন, যিনি সবাইকে চমকে দিয়ে নির্বাচনের সময় পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন।রাহুলের সভায় কুমারী শৈলজার বিজেপিতে যাওয়ার রটনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যোগ দেওয়ার মত ঘটনা দেখে মনে হয়েছিল হরিয়ানায় কংগ্রেসের অশ্বমেধের ঘোড়াকে কে আটকাবে ? কিন্তু তা নির্মমভাবে আটকে গেল। এটা কি মোদী স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন ? তাহলে তিনি গোটা চারেক সভা করে প্রস্থান করতেন না। এটাও প্রমাণ হল মোদীর জনমোহিনী ক্ষমতা নয় বিজেপি জিতেছে ঠিকঠাক প্রার্থী নির্বাচনসহ একাধিক রাজনৈতিক কৌশলে। কি সেই কৌশল ?

প্রথমত আরএসএসকে তাদের সম্মান দিয়ে প্রচারের সুযোগ। তাদের কয়েক হাজার কর্মী ও প্রচারকেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটারদের বুঝিয়েছে ও বিজেপিকে ভোট দিতে অবেদন করেছে।

দ্বিতীয়ত হরিয়ানায় জাঠ জনসংখ্যা শতকরা ২০/২২ শতাংশ। তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশী। ভুপেন্দ্র সিংহ হুডা তাদের নেতা হওয়ায়, তিনি ক্ষমতায় এলে আবার জাঠদের হাতে সব ক্ষমতা চলে যাবে বলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আশঙ্কা দানা বাঁধে। ঠিকাদারি থেকে সরকারি চাকরি, এমনকি ব্যবসা বানিজ্য সবেতেই তারা প্রধান্য পাবে আর অন্যদের কোনঠাসা করে রেখে দেবে। তাই বাকি সব সম্প্রদায়ের ভোটারদের একজোট করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এককাট্টা করার কাজটা আরএসএস সফলভাবে করতে পেরেছে। এর ফলে বেশীরভাগ ওবিসি,দলিতসহ অজাঠ ভোটাররা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। অনেকটা বাংলায় সংখ্যালঘুদের তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার মতন।

পঞ্চমত বিজেপি ও আরএসএস এই নির্বাচনকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে মাঠে নেমে মরণপন সংগ্রাম করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,তাই অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে।

ষষ্ঠত বিজেপির ভোট পরিচালনায় দক্ষতা,নিজেদের ভোটারদের সঠিক সময়ে বুথমুখী করা, যেকোন নির্বাচনে এক্স ফ্যাক্টর যা তারা করতে পেরেছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস বহু আসনে অল্প ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে তাদের নির্বাচন পরিচালনায় ত্রুটির জন্য। জেলা,শহর,ব্লক কমিটির অস্তিত্ব না থাকলে বা তা দূর্বল হলে, বুথে ভোটারদের কে নিয়ে আসবে ?

কুমারী শৈলজাকে গুরুত্ব না দিয়ে একা হুহুদার৫র হাতে গান্ডীব তুলে দেওয়ার ফলে কুমারী শৈলজা প্রচারে গা ঘামান নি। ফলে লোকসভায় পাওয়া ওবিসি ও দলিতদের ভোট কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে। এটাও হারের একটা বড় কারণ।

প্রার্থী বাছাইতে বহু ভুল ছিল।অনেক যোগ্য কংগ্রেস নেতা থাকতে শুধুমাত্র বিশেষ কোন নেতার অনুগামী হওয়াটা প্রাধান্য পেয়েছে। বহু ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিচয় যোগ্যতার মাপকাঠি হয়েছে। তার ফলে বিক্ষুব্ধ প্রার্থী ভোট কেটে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছে। এদের ও নির্দলদের মূল্যায়নে ভুল করেছে রাজ্য নেতৃত্ব,পড়ুন ভুপেন্দ্র সিংহ হুদ খুব আরেকটি কারণ হচ্ছে লোকসভায় দশটির মধ্যে পাঁচটি আসন পাওয়ায় পর তৈরী হওয়া অতিরিক্ত ও অগাধ আত্মবিশ্বাস।

'জনতা জিতিয়ে দিচ্ছে' এই মনোভাব পরাজিত হওয়ার আরেকটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

সহযোগী বা ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে থাকা দলগুলির সঠিক মুল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া ও তাদের এক ছাতার তলায় না আনা।আপ শহরাঞ্চলে ও দখুঁজ্জ হরিয়ানায় সমাজবাদী পার্টিকে সঙ্গে পেলে ফল অনেকটাই ভাল হত।

শুধুমাত্র জাঠ নির্ভরতা অন্যতম কারণ। এতে ওবিসি দলিত ও অন্যান্য অজাঠ ভোট হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ভুপেন্দ্র হুডা ও কুমারী শৈলজার লড়াইও ভোটে বেশ প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় সমস্যার চেয়ে জাতীয় সমস্যাগুলিকে প্রচারে বেশী গুরুত্ব দেওয়াও আরেকটি হারের কারণ সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগামীদিনে কংগ্রেসকে যেকোন নির্বাচনে জিততে গেলে এইসব সমস্যাগুলির দিকে নজর দিতে হবে নাহলে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা বা বিজেপির অকর্মণ্যতাকে পুঁজি করে নির্বাচনে জয়লাভ আকাশ কুসুম কল্পনা।

অভয়ার হত্যা প্রশাসনিক মদতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক খুন

ডা. শুভাংশু পাল

---

৯ ই আগস্ট ২০২৪- তারিখটা শুরু হয়েছিল একটা হাড়-হিম করা খবর দিয়ে-আরজিকর হাসপাতালে একজন কর্মরতা পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন!! আজ প্রায় আশি দিন কেটে যাওয়ার পর অবশ্য আমরা সেই ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছি। চায়ের কাপে একটা করে বর্ধমান, জয়নগর, বেহালা, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি গিলতে গিলতে ভাবতে শিখেছি, 'এসব রেপ-টেপে'র মতো 'স্ট্রে ইনসিডেন্ট' হয়ে থাকে। দু-একটা 'ছোট ঘটনা' নিয়ে 'রাজনীতি করতে' নেই। তাই আবার আমরা যে যার কাজে ফিরে গেছি- আরো কোনো বৃহত্তর আন্দোলনের স্বপ্ন বুকে নিয়ে, দিন-বদলের ইউটপিয়ায় গা ভাসিয়ে, আইন-প্রশাসন ইত্যাদির উপর আস্থা রেখে। তবে এর মাঝে আমরা রাস্তায় হেঁটেছি, প্রচুর হেঁটেছি, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি, ডাক্তারদের অনশন করতে দেখেছি ১৭দিন ধরে- দিনের শেষে হাতে পেয়েছি এক সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে।

আমরা জানিনা অভয়ার খুন-ধর্ষণের কতটা খুন আর কতটা ধর্ষণ! কেন খুন, কেনই বা ধর্ষণ! তবে আমরা জানি, সঞ্জয় রায় অশ্লীল ভিডিও দেখে, যৌনপল্লীতে যায়, মদ খায়। কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এভাবে চরিত্রায়ণ না করা হলে আমরা বিশ্বাস করবো কেন যে ঘটনাটি সেই ঘটিয়েছে! আচ্ছা যদি বলি কোনো ডাক্তার খুন-ধর্ষণ করেছে বা করিয়েছে, শুনতে ভালো লাগবে কি! তার চেয়ে বরং এটা অনেক বেশি শ্রুতিমধুর- সঞ্জয় রায় মদ্যপ অবস্থায় একজন প্রমাণ সাইজের মেয়েকে ধর্ষণ করে শেষ করে ফেললো কুড়ি মিনিটের মধ্যে, প্রমাণস্বরূপ রেখে গেল তার ট্রেডমার্ক ব্লুটুথ ইয়ারফোন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সমকক্ষ পুলিশও ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাকে ধরে ফেললো। কিন্তু তাও কেন জানিনা তাদের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ও সৎকারে ভীষণ তাড়া, সংলগ্ন ঘরের দেওয়াল ভাঙার তাড়া! কেন জানিনা রাত দখলের রাতে উন্মত্ত দুষ্কৃতীর দল সেমিনার রুমের বাকিটুকু ভাঙতে চলে আসে- সঞ্জয়ও কি জানে শুধুমাত্র তাকে বাঁচাতে প্রশাসন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে? একজন সামান্য সিভিককে বাঁচাতে এত আয়োজন, সেও কি ভেবেছিল!!

কিছু দুষ্টু লোকেরা অবশ্য এসব কথা তুলে অনেক প্রতিবাদ-মিটিং-মিছিল করেছে- তাই বাধ্য হয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও সিবিআই নামক দু'জন শান্তিপ্রিয় মানুষকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারি মদতে কীভাবে সরকারি হাসপাতালে দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে তার কিয়দংশ জানাজানি হওয়ায়, জনরোষ কমাতে সন্দীপ ঘোষ, আশীষ পাণ্ডের মত কিছু মহৎ লোকেদের গ্রেপ্তারও হতে হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের 'শুয়োমোটো' কেসের 'শুয়োপোকা'র মতো অগ্রগতি ও সিবিআইয়ের অসাধারণ চার্জশিটের দৌলতে তাঁদের হাজতবাসের দিনও শেষ হয়ে এলো প্রায়! ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের চেয়ারটা সন্দীপ ঘোষের পথ চেয়ে কুঞ্জ সাজাচ্ছে ইতিমধ্যে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। প্রথম দিন সব কার্যকলাপ শুনে মাননীয় বিচারপতি পারদিয়ালা স্বগতোক্তির মতো বলেও ফেলেছেন, পুলিশের এমন ভূমিকা ত্রিশ বছরের কেরিয়ারে কোনোদিন দেখেননি। কিন্তু তারপর অভয়ার বিচার নিয়ে কম, ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে সেখানে। ক্রমবর্ধমান শুনানির তারিখ, আর ক্রমহ্রাসমান শুনানির সময়কালের আবহে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে অশ্রুবিসর্জন করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার তথ্য লোপাটের তদন্ত হয়েছে, কিন্তু এখন অব্দি কুলকিনারা কিছু মেলেনি, ভবিষ্যতে মিলবে এরকম আশ্বাসও বিশেষ নেই।

জুনিয়র ডাক্তারেরা যদিও লড়াই করেছে অনেক- কখনো লালবাজারে, কখনো স্বাস্থ্য ভবনে, কখনো ধর্মতলায়- রাস্তায় পড়ে থেকে আন্দোলন হয়েছে। সিনিয়র ডাক্তারদের একটা বড় অংশ তাদের সাথে পা মিলিয়েছেন। আর তাদের কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে বাংলার সামগ্রিক মানবিকতা। ডাক্তারদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা রাস্তায় পড়ে থেকেছে, বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছু মানুষ নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে ধর্ণামঞ্চে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন- শুধু সুবিচারের দাবিতে। স্বাধীন ভারতের সর্ববৃহৎ গণঅভ্যুত্থানের সাক্ষী থেকেছি আমরা। শাসকের চোখ রাঙানি তুচ্ছ করে, চোখে চোখ রেখে লড়াই করে গেছে তারা। কিন্তু 'গণতন্ত্র' নামক প্রহসনের ফাঁকে সেই আন্দোলনও তলিয়ে গেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্ল্যাক হোলে। আমরা পুলিশ কমিশনারের অপসারণ পেয়েছি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা-র অপসারণ পেয়েছি, স্বাস্থ্য সচিবের অপসারণের দাবিতে অনশন অব্দি করেছি।

কিন্তু যে অমানবিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পুলিশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এই খুন-ধর্ষণের সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট হলো, শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথেই বৈঠকে বসতে হলো- তাঁর অপসারণ চাওয়া আর হলো না। এটাই সবচেয়ে বড় প্রহসন গণতন্ত্রের। অহিংস পথে ন্যায্য দাবি আদায় করা গেলে স্বাধীনতা সংগ্রামে এত রক্তক্ষয় হতো না, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং বা সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমরা তথাকথিত সুশীল সমাজ এই 'আপাত' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অরাজকতার পথে হাঁটার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা। তাই শাসকও জানে আমাদের সীমাবদ্ধতাখ আইন-প্রশাসন-তদন্ত ইত্যাদি শব্দবন্ধের মোড়কে তার অনিবার্য নিষ্কৃতিলাভ যে শুধুমাত্র সময় ও ধৈর্যের একটি সরল সমীকরণ মাত্র, সেটা তারা ভালোই জানে।

আর সেই পথ ধরেই কলেজে কলেজে হুমকি সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আজ, নতুন দল গঠন করে- ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন। ভবিষ্যতে এরা প্রশাসনিক সাহায্যে আরো হিংস্রভাবে ফিরে আসতে চলেছে, সেটা বলাই বাহুল্য। যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এত আন্দোলন, আগামী দিনে এই লুম্পেনরা পুনরায় নির্বাচনী প্রহসন করে সেই পরিবেশের কণ্ঠরোধ করবে, আবার সেই গণতন্ত্রের মোড়কেই- ঠিক যেভাবে মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনে কারচুপি করে ক্ষমতা দখল করে আছে এই তৃণভোজী লুম্পেনরা। তাই আগামীর লড়াই আরো কঠিনতর হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

তবে আন্দোলনের একটাই পাওনা- গণজাগরণ। বঙ্গদেশের কোনো রাজপথ নেই, যেখানে অভয়ার বিচারের দাবিতে কেউ হাঁটেনি। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে, এমনকি তার সীমানার বাইরেও আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। কখনো মেয়েরা রাত দখল করেছে, কখনো ইস্ট-মোহন সমর্থকেরা প্রতিবাদ জানিয়েছে, কখনো হয়েছে নবান্ন অভিযান, মিছিল আর সমাবেশের হিসেব তো ছেড়েই দিলাম। সরকারি প্রতিঘাত নেমেছে, কখনো পুলিশের বেশে, কখনো নেতা-মন্তানদের হাত ধরে। আইনি হেনস্তা, শারীরিক হেনস্তা, অকারণে গ্রেপ্তারি, বুকে 'প্রতীকী অনশনকারী' লেখার জন্য অন-ডিউটি মেডিক্যাল অফিসারকে আটক করা- প্রশাসনিক পেশির আস্ফালন কম কিছু হয়নি। মানুষ তবু দমেনি, মানুষ তবু রাজপথে থেকেছে, মানুষ তবু আপোষহীন সংগ্রামের পথে হেঁটেছে।

আমরা সবাই জানি, অভয়ার প্রকৃত বিচার হয়তো অধরাই থেকে যাবে। ৯ই আগস্ট সকালে সন্দীপ ঘোষের নেতৃত্বে সরকারের বাঘা বাঘা মাথারা প্রমাণ লোপাটে নেমেছে, সেই দলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও ছিলেন। ময়নাতদন্ত করেছে দলের লোকেরা, দেহ দাহও হয়ে গেছে ততোধিক দ্রুততায়। চারপাশের যা ঘর ছিল, কলকাতা পুলিশ সেগুলোও দায়িত্ব নিয়ে ভেঙে সিবিআইকে দিয়েছে। সুতরাং ভয়ংকর কিছু মিরাকল না হলে সিবিআই চাইলেও, দোষী কারা হয়তো প্রমাণ করতে পারবেনা। অভয়ার মা-বাবা সেই অন্ধকারকে আঁকড়েই বাঁচবেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 'দোষীদের সাজা হবে' বলে দায় সারবেন।আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিধান দেবেন, ন্যায় ও চিকিৎসায় ধর্মঘট হয়না- কিন্তু আমাদের বিচারব্যবস্থা বিচারের নামে সেই 'তারিখ পে তারিখ'-র প্রহসন করবে। আর রোজ একটা করে অভয়া, নির্ভয়া ইত্যাদি প্রভৃতি- একদিন নামও বুঝি ফুরিয়ে যাবেখ

থেকে যাবে শুধু এই গণ-জাগরণ। একদিন সমাজের সব স্তরের মানুষ রেগে গিয়ে, রাস্তায় নেমে, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করেছিল, তাতে নবান্নের চোদ্দ তোলা অব্দি কেঁপে উঠেছিল। এটুকুই তোলা থাক পাওয়ার খাতায়- বাকিটা থাক ভবিষ্যতের গর্ভে। আন্দোলনের শেষ হয়, প্রতিবাদের শেষ হয়না, প্রতিরোধের শেষ হয়না। তাই আন্দোলন থেমে গেলেও আমাদের প্রতিবাদ করার শিরদাঁড়াটা যেন ঋজু থাকে সর্বদা- অভয়ার জন্য এটুকু তো করাই যায়!!

(ডক্টর'স ডায়ালগের সৌজন্যে)

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক ঃ যে সত্য উদঘাটিত হল

শুভ মিত্র

গত ২১অক্টোবর নবান্নতে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকের পর ডাক্তাররা তাঁদের অনশন তুলে নিয়েছেন। জুনিয়র ডাক্তাররা বলেছেন, সরকারের অনুরোধে নয়, অভয়ার পিতা মাতার অনুরোধে ও সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই এই অনশন প্রত্যাহার। তবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট জানিয়েছে আন্দোলন চলবে। দেবাশিস হালদার,অনিকেত মাহাতো, আসফাকুল্লা নাইয়া বা কিন্‌জল নন্দদের নেতৃত্বে ১৭ জনের প্রতিনিধিদল নবান্ন সভাগৃহে আহূত বৈঠকে তাঁদের দশ দফা দাবীর সমর্থনে স্পষ্টভাবে বক্তব্য রাখেন।

বৈঠকে ঢোকার আগে জুনিয়র ডাক্তারদের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস লেখা' ব্যাজ খুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ সরকারের কাছে বিচারটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তা বোঝানো।

জুনিয়র ডাক্তাররা আগের বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজী হন নি,বলেছিলেন সাব জুডিস ম্যাটার,করা যাবে না।অথচ এদিন লাইভ স্ট্রিমিং হল যা ডাক্তাররা বৈঠক শেষে জানতে পারে। এবারে কি এটা সাব জুডিস ছিল না?

আরজিকরের অধ্যক্ষ মানস বন্দোপাধ্যায়কে রীতিমতো হুমকি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অন্য মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষদের সাবধান করে দিলেন যাতে তারা কোনও তৃণমূলি ও দুর্নীতিগ্রস্থ ডাক্তার বা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন। অধ্যক্ষ ডা. মানস বন্দ্যোপাধ্যায় যে ৪৭ জনকে সাসপেন্ড করেছিলেন তা কেন তার অনুমতি নিয়ে করা হয় নি তার জবাবদিহি চাইলেন। এই সাসপেন্সসন যে ন্যাশানাল মেডিকেল কমিশনের নিয়ম মেনে করা হয়েছে তা জানানো ও তারা যে কুখ্যাত দুস্কৃতি তা বলার পরও তাদের অভিযুক্ত বলতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রবল অনীহা। যে কন্যাসম ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রীর চোখে চোখ রেখে আইনত কাকে অভিযুক্ত বলে আর কাকে দোষী বলে তা যেভাবে বলেন , তা দেখে মনে হল এই যৌবনকে দেখেই কবি সুকান্ত লিখেছিলেন ঃ

''আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি''

সাসপেন্ড ডাক্তারদের সম্পর্কে অনিকেত মাহাতো যখন বললেন আমরা কি ক্রিমিন্যাল ও ধর্ষকদের পক্ষ নেব? দয়া করে এদের সমর্থন করবেন না।আমাদের মহিলা ডাক্তাররা এদের কথা বলার জায়গা পায় নি,। ওরা যেসব অত্যাচার করেছে তা সর্বসমক্ষে বলা যায় না,আপনাকে তা বললে আপনি মহিলা হিসাবে লজ্জা পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই ৪৭ জন সাসপেন্ড হওয়া ডাক্তারের হয়ে বললেন এরা থ্রেটের শিকার। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া একদল দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মী, জুনিয়র ডাক্তার ও পড়ুয়ারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, তা সমর্থন করলেন প্রকারান্তরে।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েও জানেন না পড়ুয়া ডাক্তার ও জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে কি পার্থক্য। এটাও শিখতে হল এদিন ঐ জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল যে সুপার, অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয় ও তাদের সিদ্ধান্ত সরকারকে জানানো বাধ্যতামূলক নয় তাও বোধহয় তার অজানা। মুখ্য সচিব,স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্যসচিব,পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও প্রতিটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হলেও অধ্যক্ষদের মুখে সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ রাখতে নির্দেশ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের মধ্যে বলেই দেন যে আপনাদের শুনতে ডাকা হয়েছে,কথা বলতে নয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের যে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নম্বর বিকৃতির অভিযোগ রয়েছে তাকে মাথায় রেখে তদন্ত কমিটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করলেও তা দক্ষ স্ট্রাইকারের মত ডজ করে এড়িয়ে গেলেন। রাজনীতির কৌশলে জুনিয়র ডাক্তাররা যে অনেক অপটু তা বুঝিয়ে দিলেন।

আরও যে প্রশ্নগুলো জুনিয়ার ডাক্তাররা করতে পারতেন তা হল, আরজিকরের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি সুপার সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে প্রচুর নথি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ও স্বাস্থ্যভবনে জমা দিয়েছিলেন তার তদমে্তর কি হল? মুখ্যমন্ত্রীকে জমা দেওয়া নথি কি করে সন্দীপ ঘোষের বাড়ীর আলমারি থেকে উদ্ধার করল সিবিআই?

বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় অথবা হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন ও দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করতেই কথা ঘুরিয়ে দিলেন। ডাক্তারদের ৮০০০ পদ শূণ্য, নার্সদের ২৩০০০, টেকনিশিয়ান ১৩৫০০ পদে নিয়োগের কথা বলতেই তিনি ওবিসি মামলার অজুহাত দিলেন। হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট কখনও নিয়োগ বন্ধ করতে বলে নি। বলেছে ২০১০ সালের পর যেসব জাল শংসাপত্র তৈরী হয়েছিল তা কাজে লাগানো যাবে না। ২০০১ সালের পর দেওয়া শংসাপত্র কাজে লাগানো যাবে।

এই বৈঠকের কদিনের মধ্যেই তৈরী হয়েছে পাল্টা তৃণমূল পোষিত জুনিয়র ডাক্তার এসোশিয়েশন। এদের দিয়ে সবক শেখানো হবে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের। তাদের লাইফ হেল করে দেওয়ার চেষ্টাও হবে।তারা ঠিকমত সুস্থিরভাবে নিজেদের পাঠক্রম বা ইন্টার্নশিপ বা পিজিটি শেষ করতে পারবে কিনা তাও প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে। কিন্তু এত কিছু করেও কি একসময় রাস্তায় আন্দোলন করা নেত্রী কি আঠারো বছরের যৌবনকে পরাজিত করতে পারবেন? যেমনটি হয়েছিল তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে?

পথে প্রান্তরে : ডান্ডির চটকল শ্রমিক ও স্কটল্যান্ডে দীপাবলি

শুভ বসু

ডান্ডির হেমন্তের সকালের এক অপূর্ব মাধুর্য্য ছিল। আমার পান্থশালা থেকে বের হয়ে একটু হাঁটলেই দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ দেখা যেত। সবুজের মখমলে আচ্ছাদিত মাঠের পরেই দূরেস্টেথা নদীর রুপালি রেখা সূর্য্যের সোনালী রোদ্দুরে ঝিকমিক করতো। তার উপরে ছিল্টথা নদীর উপর রেল সেতু। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নির্মিত লোহার সেতুটা তখনও ছিল ১৯৯০ সালে। পরে ২০০৩ সালে তা আবার পুনর্নির্মিত হয়। ওই রেল সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় গম গম একটা আওয়াজ হতো আর দূরের দিক্‌চক্রবালে সে আওয়াজ মিলিয়ে যেত। চারদিকের স্থির নিস্তব্ধতার মধ্যে গতিময় আওয়াজ এক অদ্ভুত শব্দের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতো। শহরের আর এক পাশে ছিল উঁচু টিলা। তার উৎস নাকি কোনো সুদূর অতীতের আগ্নেয়গিরির লাভার উদ্গিরণ থেকে। সেই টিলার উপর থেকে আকাশের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র দেখা যেত। ডান্ডী হলো সমুদ্র এবং Tay নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এক বন্দর নগরী। একসময় ডান্ডী ছিল শিল্প নগরী। শহরেই ছিল চিমিনির সাইরেন - শংখ আর মজুরদের বস্তির সহাবস্থান। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রায় ১০০ চটকল ছিল ডান্ডির রাস্তায়। পৃথিবীর বৃহত্তম চটকল ছিল ডান্ডী শহরে। প্রায় ১৪০০০ শ্রমিক কাজ করতো সেখানে। তাদের নিজস্ব রেল গাড়ি ছিল , বিদ্যালয় ছিল এবং foundry ছিল। ডান্ডির পুরোনো বস্তি সবই এখন আধুনিকরণের ঠেলায় বদলে গেছে।

প্রতিদিন আমি আমার পান্থশালা থেকে হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গ্রন্থগারের নিচে মহাফেজখানায় দলিল দস্তাবেজ দেখতে বসতাম। তারপরে দুপুর অব্দি দলিল দস্তাবেজ দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের খানা পিনার দোকানে আট তলার উপরে Tay নদীর শোভা দেখতে দেখতে খানা খেতাম। আমার বয়সী ছেলেরা আমায় পাত্তা দিতো না। কিন্তু মেয়েদের কথা আলাদা। তারা প্রায়ই আমার সঙ্গে বসত অপার কৌতূহল নিয়ে। এই ছোটখাট বদখত দেখতে ছেলেটা কোথাকার, কি জন্যে এসেছে, কি পড়ছে এখানে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি আড্ডা দিতে ভালোবাসতাম তাদের সঙ্গে। একটি মেয়ে আমায় বলেছিলো সে curry খেতে খুব পছন্দ করে। আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে। ঊনবিংশ শতকের লখনৌর মতো আদাবের পরাকাষ্ঠা না থাকলেও মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার কোনো সপ্রতিভতার অভাব হতো না। আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে বললাম তাহলে -তুমি একজন এশিয়ান বয়ফ্রেইন্ড জোগাড় কর সে তোমাকে রোজ রান্না করে খাওয়াবে। মেয়েটি আরো সেয়ানা। সে আমায় বললো -সব এশিয়ান পুরুষ তো ভালো রাঁধতে পারে না। কাজেই বুঝবো কি করে ?
আমি বললাম - নেমন্তন্ন করে দেখো। তারপরে সে তোমায় নেমন্তন্ন করবে তখন বুঝবে। মেয়েটি বললে -অরে আমার অনেক স্কটিশ ছেলে বন্ধু আছে। তারাও রান্না করে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম -আহা তাতে কি আছে। তাহলে তো স্কটিশ এবং এশিয়ানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। তুমি হবে সেই প্রতিযোগিতার মূল আকর্ষণ।

এরম কথা চলতো অনেক মেয়েদের সঙ্গে। আমার বয়স তখন ২৭। আমার সঙ্গে যে সব মেয়েরা বসত তারা অধিকাংশই বছর চব্বিশ পঁচিশের। তারা মূলত ছিল স্নাতক উর্ধস্তরের ছাত্র ছাত্রী। তবে সবাই যে খোলা মনে আড্ডা দিতো এবং flirt করতো তা নয়। একবার দুটি জীবন বিজ্ঞানের গবেষণার ছাত্রী আমার সঙ্গে বসেছিল। তারা আমায় জিজ্ঞেস করলো -তুমি ডান্ডী তে কি পড়ো ? আমি বললাম -আমি ডান্ডিতে পড়ি না। আমি পড়ি কেমব্রিজ এ। এখানে এসেছি গবেষণার সূত্রে চটকল নিয়ে কাজ করতে । এ কথা শুনে মেয়ে দুটি কেমন যেন রক্ষণশীল খেলতে শুরু করলো। তারা বললো - কেমব্রিজ এ পড়াশোনা হয় না। ওটাতো ইংলিশ Toffee-nosed দের বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি তখন আমার নাকে হাত দিয়ে বললাম -আমার নাকটাতো টফি দিয়ে তৈরী বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েগুলি তখন হেসে কথা ঘুরিয়ে দিলো। এরম আড্ডা রোজই হতো। তবে কোনো মেয়ে আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বসত না। কারণ প্রথমবারেই তাদের আমাকে বাজিয়ে দেখে মনে হতো যে আমি অচল আনি, বাজারে চলবে না। আমার অবশ্য নিত্য নতুন স্কটিশ মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে ভালোই লাগতো। খাওয়ার রোমান্টিক পর্বের পর আবার ডান্ডী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাতালে অবস্থিত মহাফেজখানায় ঢুকে যেতাম। জোয়ান আউল্ড মহাফেজখানায় অধ্যক্ষ দারুন জমাটি আড্ডাবাজ মহিলা ছিলেন। যতক্ষণ মহাফেজখানায় বসতেন ততক্ষণ তিনি ছিলেন ভীষণ গম্ভীর। কিন্তু তারপরেই তাঁর চেহারা বদলে যেত। দপ্তর বন্ধ হবার পরে শীষ দিয়ে গান করতেন। নিজেই মোটর সাইকেল চালাতেন আর চালাতেন বেজায় জোরে। আর ছিলেন ভীষণ ভাবে মার্ক্সবাদ বিরোধী। আমার কাছে দাবি করতেন তিনি শ্রমিক শ্রেনীতে জন্মেছিলেন কিন্তু তাঁর শ্রেণীগত পাচাপাচানির তত্ত্ব ভালো লাগে না। আমার কাছে তিনি দীপেশ চক্রবর্ত্তীর Rehtinking Workingclass History বইটি ধার করে পড়েছিলেন। তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো বইটা। এর দুবছর পরে আমি যখন ওই একই মহাফেজখানায় গবেষণা করতে ফেরত যাই, আমি তখন ওনার খোঁজ করি। তখন শুনেছিলাম উনি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনাইতেই মারা গেছেন মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে। প্রাণবন্ত এই মহিলার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনটা বড়

খারাপ হয়ে গিয়েছিলো।

আমি কখনো যেতাম ডান্ডী শহরের অভিলেখাগারে। সেখানে ডান্ডীর জুট এন্ড ফ্লাক্স ইউনিয়ন এর দলিল দেখতাম। ১৯২৭ সালে ডান্ডীর থেকে একটি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ডান্ডীর শ্রমিকদলের সংসদ সদস্য কলকাতায় চটকলে সরেজমিন তদন্তে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই কলকাতার চটকলের শ্রমিকদের অবর্ণনীয় কষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁদের সংগ্রামে সহযোগিতা করেছেন। সেই সময় আবার ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ফিলিপ স্প্রাট কলকাতায় এসেছিলেন শ্রমিকদের সংগঠিত করতে। কাকাবাবু মুজাফ্ফর আহমদের জীবনী গ্রন্থেও তাঁর উল্লেখ আছে। ফিলিপ স্প্রাট মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। তবে কারাগারে তিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন দিবা স্বপ্নে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দেন কিন্তু ভারত ছাড়েন না। পরে তিনি ভারতের চরম দক্ষিণপন্থি দল স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য হন। তবে ডান্ডীর শ্রমিকদের অনেকেই কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসতেন। তাঁরা কারখানার সহযোগী হিসাবে কাজ শুরু করলেও তাঁরা অনেকেই কারখানার ম্যানেজার হিসাবে কাজ শেষ করতেন। তাঁরা ডান্ডী তে শ্রমিকশ্রেণীর সদস্য হলেও কলকাতায় তাঁরা হতেন ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি। তাঁরা পুরসভার সদস্য হতেন, পুরপিতাও হতেন, তাঁদের জন্যে বিশেষ আমোদনের ব্যবস্থা থাকতো যাতে ভারতীয়রা থাকতেন অনুপস্থিত। তাদের বাড়ি হতো গঙ্গার ধারে তাক লাগানো বিরাট বাংলো। তাদের জন্য হতো গল্ফ প্রতিযোগিতা। কিন্তু দেশে ফিরে তাদের অবস্থা হতো আবার যে কে সেই। তবে অনেক স্কটিশ সহযোগী জন্মসূত্রে শ্রমিক শ্রেণীর সদস্য হওয়াতে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন। সমরেশ বসুর উপন্যাস এবং গল্পে তার অল্প আভাস পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক দলিলেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। জোয়ান আউল্ড এর সূত্রে জর্জ রোবার্টসন বলে প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধর আমি একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। তিনি কলকাতায় চাকরি করতেন ১৯৪০ সালে চাপদানিতে একটি চটকলে। আমি জিজ্ঞাসা করি -আপনারা কলকাতার জীবনের অভিজ্ঞতা কিরম ? - খুব ভালো এবং খুব মন্দ। আমি ছিলাম শ্রমিক পরিবারের ছেলে। এখনো শ্রমজীবী চাকরিই করি। আমি এখানকার সাফাই কর্মীদের প্রধান। কলকাতায় আমার বিরাট বাড়ি ছিল। কারখানা আমায় গাড়ি দিয়েছিলো। আমাদের কোম্পানির নিজস্ব স্টীমার ছিল তাতে ঘুরে বেড়িয়েছি নৈহাটী থেকে বজবজ অব্দি। - আপনি দুর্ভিক্ষ দেখেছিলেন ? - অরে ছোকরা সে কথা আর বোলো না। শুধুই বুভুক্ষ মানুষের ঢল। তারা ভাতের মাঁচায় (রাইস ওয়াটার)। আমি তো একদিন কেঁদে ফেলেছিলাম। আর আমার কাছে আমাদের স্কটিশদের বৈভব ওই অপরিসীম দারিদ্রের মধ্যে একান্ত বিবেকে লাগতো। আমি শ্রমিক পরিবারের ছেলে। - আপনার ঔপনিবেশিক পরিবেশ ভালো লাগতো না? -ভাই আমি শ্রমিক পরিবারের ছেলে। আমার মা ডান্ডী তে চটকলে কাজ করতেন বাবা বন্দরে ডকে। কলকাতায় গিয়ে আমার এক বন্ধু হলো বাঙালি- নাম অভয় সরকার। তার সঙ্গে খুব ভাব হলো। একদিন তাকে সাইকেলের পিছনে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমার ম্যানেজার সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি পরে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমায় বললেন আমরা এখানে সাহেব। আমাদের ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। তুমিও করবে না। আমি প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু পরে আমার বন্ধু অভয় বললেন যে বেশি প্রতিবাদ করলে ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে তুমি জর্জ প্রতিবাদ করো না। তারপরে আমি আমার ছেলেমেয়েদের স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলাম ম্যানেজার বললেন জর্জ তোমার ছেলে দের দার্জিলিং এ সেন্ট পল্স স্কুলে ভর্তি করো। স্থানীয় স্কুলে ভারতীয়রা পড়ে। আমার এ সব ভালো লাগতো না। পরে স্বাধীনতার দিনে আমি ভারতের পতাকা আর ইউনিয়ন জ্যাক দুটি নিয়ে নাচানাচি করছি আর আমার ম্যানেজার আমার দিকে রক্ত চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার মনে হতো ঔপনিবেশিক সম্পর্ক আমাদের সাহেবদের একটি চিড়িয়াখানার জন্তু করে রেখে দিয়েছিলো।

- আপনার অভয় সরকারের সঙ্গে পরে যোগাযোগ ছিল। -অরে সে তো পরে আমাদের চটকলের ম্যানেজার হয়েছিল। আমি তাকে ডান্ডী তে ১৯৫০ এর দশকে জুট টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এর ফর্ম পাঠিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। সে আর এখন নেই।

দেখলাম বৃদ্ধের চোখ ছল ছল করে উঠলো। বুঝলাম বন্ধুত্ব সেকালে এবং একালে বর্ণ, জাতীয়তা বা ধর্মের বেড়া মানে না। মানুষ মানুষই থাকে। ডান্ডী তে থাকা কালে আমি যে বর্ণ বিদ্বেষের শিকার হই নি তা নয় কিন্তু স্কটিশ সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি তার তুলনায় তা একান্ত নগন্য।

সন্ধ্যে বেলায় প্রথম দিকে একা লাগতো। পাবে একা যেতে ভালো লাগতো না। হঠাৎ মনে পড়লো স্কটিশ লেখক Ian McEwan লিখেছিলেন স্কটল্যান্ডের যেকোনো শহরে তিনটে জিনিস থাকে একটি প্রেসবিটারিয়ান গির্জা, একটি মদ্যশালা বা পাব আর একটি বাংলাদেশী/ভারতীয় রেস্তোরা। মনে হতেই সন্ধ্যে বেলায় একাকিত্ব কাটানোর জন্যে আমি খুঁজে বার করলাম এক বাংলাদেশী রেস্তোরা- বে অফ বেঙ্গল। সেখানে গিয়ে বাংলায় বললাম - আমি পশ্চিমবাংলার ছেলে। আপনাদের এখানে খাবো তো বটেই কিন্তু দোকানের খাবার দেবেন না। আপনাদের যদি রুই মাছের কালিয়া থাকে তো দেন।

আমার কাছে দোকানের মালিক এগিয়ে এলেন। গল্প হলো। তাঁর নাম আব্দুল লতিফ। তিনি বললেন তিনি ঢাকার ছেলে

শ্রীহট্টের নন। সিলেটিরাই ব্রিটেনের রেস্তোরা ব্যবসা চালান। ১৯৯০ এর দশকে ৮,৫৫০ টি বাংলাদেশী রেস্তোরা ছিল ব্রিটেনে আর সেখানে কাজ করতেন কয়লা খনি, স্টিলের কারখানা এবং জাহাজ তৈরির কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের থেকে বেশি কর্মচারী। লতিফ সাহেব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সাহেবের রোষানলে পড়ে দেশ ছেড়েছিলেন। তাঁর আব্বা ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত চটকল আদমজীর কর্মী। তিনি একবার ডান্ডী তে এসেছিলেন প্রশিক্ষণ নিতে। ফলে ছেলে দেশান্তরিত হয়ে স্কটল্যান্ডের প্রান্তে এসে হাজির হলেন। খুলে ফেললেন খাবারের দোকান। এখন বেশ ভালো অবস্থা। নানা গল্প হলো তাঁর সঙ্গে। দোকানের কর্মীরাও কাজের ফাঁকে আমার সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছিলেন। লতিফ সাহেব কে পয়সা দিতে গেলে কিছুতেই দাম নিলেন না। বললেন আজকের দিনে মেহমানদারী তাঁকে করতে দিতে। তারপরে বললেন - আজকে আপনাদের দীপাবলি না।

আমার কোনো ধারণা ছিল না কালী পুজো কবে। আমি বললাম হতেও পারে। লতিফ সাহেব দোকানের ভিতরে গেলেন। তারপরে দোকানের স্পিকারএ রুনা লায়লার গান চলছিল --

- বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িতে আইলাম --- থেমে গেলো। হঠাৎ শুরু হলো সুচিত্রা মিত্রর গলায়; -

''হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে, ঘিরে, ঘিরে
হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো, আপন আলো
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।
হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
শূন্য এখন ফুলের বাগান
দোয়েল, কোকিল গাহে না গান
কাশ ঝরে যায়, ঝরে যায়
ঝরে যায় নদীর তীরে
যাক অবসাদ বিষাদ কালো
দীপালিকায় জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো, আপন আলো
শুনাও আলোর জয়বাণীরে''

আব্দুল লতিফ সাহেবের কল্যানে আমার দীপাবলিও হয়ে গেলো স্কটল্যান্ডে।

লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

হাসিনার দুঃশাসনের মাপকাঠিতে বঙ্গবন্ধুকে বিচার করা ঠিক হবে না

মাহফুজ আনাম

সাম্প্রতিক দুটি ঘোষণা আমাদের আশ্চর্য করেছে। প্রথমত, আটটি জাতীয় দিবস বাতিল এবং দ্বিতীয়ত, উপদেষ্টা নাহিদের বক্তব্য, 'অন্তর্বর্তী সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে বিবেচনা করে না।'

জাতীয় দিবস বাতিলের বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতামত প্রায় একই। তবে, দ্বিমত রয়েছে তিনটি দিবস নিয়ে; ৭ মার্চ (বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের দিনটি), ১৫ আগস্ট (বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রায় সব সদস্যকে হত্যাকাণ্ডের দিন) এবং ৪ নভেম্বর (গণপরিষদে যেদিন সংবিধান গৃহীত হয়)। এই দিনগুলোতে ইতিহাস রচিত হয়েছিল এবং কোনোভাবেই এগুলোর গুরুত্ব কমানো উচিত নয়।

আমাদের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোচ্চ নেতা। মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, জেনারেল ওসমানীসহ আরও অনেকেরই অবদান রয়েছে এই সংগ্রামে। নিজ নিজ অবদান অনুযায়ী ইতিহাসের পাতায় তাদের অবিস্মরণীয় অবদান ইতোমধ্যেই স্বীকৃত।

আমাদের মতে, বঙ্গবন্ধুর অবদান দুটি পর্যায়ে বিচার করা উচিত। প্রথম, স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়, ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশের ফিরে আসার পর। প্রথম পর্যায়ে তরুণ বয়স থেকেই তিনি বাঙালির অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সমগ্র বাঙালি জাতিকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হওয়া, সেটা দাবি করা এবং প্রয়োজনে সেই দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করার আত্মবিশ্বাস তিনি আমাদের মধ্যে এনে দেন। সর্বমোট ১৩ বছর কারাবন্দি থাকলেও তিনি কখনোই আপস করেননি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুখপাত্রে পরিণত করে। স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব অসামান্য সাহস ও সততার সঙ্গে পালন করেছেন। পাকিস্তানি শাসকের শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করার যে সংগ্রাম তা তিনি আজীবন করে গেছেন, তাতে কোনো দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। তিনিই সেই নেতা, যিনি হিংস্র ও বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে অস্ত্র ধরার

অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বাণী, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সর্বস্তরের সাধারণ বাঙালিদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনিই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা।

কিন্তু তিনি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেন; বিশেষত, একটি গণতান্ত্রিক নীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। রক্ষীবাহিনী গঠন এবং রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য এই বাহিনীর ব্যবহার সবসময়ই সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু মূলত যে কারণে তাঁর ভাবমূর্তি ও সম্মানহানি হয়েছে সেটা হলো, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে একদলীয় শাসন কায়েম করা। সেটাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসনের সূচনা।

এমন অনেক নেতাই আছেন, যারা বিপ্লবে সফল হলেও জাতি গঠনে কিছুক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছেন। তাঁরা এমন সব ভুল করেছেন, যা দেশের মানুষের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ, দুর্দশা, এমনকি তাদের মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে চীনের মহান নেতা মাও সেতুংয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর পুরোটা জীবন কেটেছে দেশের মানুষকে ভালোবেসে, তাদের জন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' ও 'কালচারাল রেভ্যুলেশন' নীতি বাস্তবায়নের ফলে অগণিত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নিপীড়ন হয়েছে। অন্যান্য বিশ্বনেতার এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। বঙ্গবন্ধুও অনেক ভুল করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ব্যক্তিদের মতো তাঁকেও সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হবে, যদি যোগ্য ইতিহাসবিদদেরকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়;রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের নয়। আমরা কোনোক্ষেত্রেই যেন শেখ হাসিনার আদ্যোপান্ত ত্রুটিপূর্ণ, অগণতান্ত্রিক, জনস্বার্থবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী, অসহিষ্ণু ও ফ্যাসিবাদী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর অবদান মূল্যায়ন না করি। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করা, আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলা, ছয় দফা দাবি তোলা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিস্ময়কর ফলাফল অর্জন, ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কার্যত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে অকার্যকর করে দেওয়া আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় মুহূর্তগুলোর অন্যতম, যা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও অবিসংবাদিত ভূমিকার কারণে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনমানুষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা;বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা (অনেকটাই সাম্প্রতিক সময়ের মতো);অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু এর সবই সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর পাহাড়সম ব্যক্তিত্ব, উপস্থিতি ও দ্ব্যর্থহীন নেতৃত্বের কারণে। গত সাড়ে ১৫ বছরে শেখ হাসিনা যা করেছেন, সেটা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুর এসব ভূমিকাকে আমরা কোনোভাবেই ছোট করে দেখতে পারি না।

মাহফুজ আনাম, একজন অত্যন্ত সম্মানিত সাংবাদিক। তিনি ঢাকার Daily Star এর সম্পাদক। মাহফুজ আনাম, শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকার সময় তাঁর অনেক পদক্ষেপের খোলাখুলি যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি বর্তমান সরকারের বঙ্গবন্ধু বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থানকেও সমালোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় Daily Star এ গত ১৮ অক্টোবর প্রকাশিত তাঁর এই নিবন্ধটি আমরা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় পুনরায় প্রকাশ করলাম।

৩১ অক্টোবর : ইন্দিরা গান্ধীর শহীদত্ব বরণের দিন স্মরণে

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ , ইন্দিরা গান্ধী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন

কয়েক বছর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংক্রান্ত মহাফেজখানায় রাখা ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত নথিগুলি Declassify করা হয়েছে। এগুলি এখন দেখা যায়। এই সব নথি'র ওপর ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে 'নিক্সন, ইন্দিরা এন্ড ইন্ডিয়া-পলিটিক্স এন্ড বেয়ন্ড' বইটির লেখক কল্যাণী শঙ্কর। বইটিতে ৬ ডিসেম্বর,১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জার এর মধ্যে আলোচনার পূর্ন বিবরণ আছে।এই সময়ে ওখানে মার্কিন সেনাধক্ষ হল্ডারম্যানও উপস্থিত ছিলেন।

ওই আলোচনার সময় নিক্সন বারবার ইন্দিরা গান্ধিকে শুয়োর, ডাইনি ইত্যাদি বলে উল্লেখ করে তাঁকে উচিৎ শিক্ষা দেবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন।

১৯৭১- এর ৩ ডিসেম্বর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। এর একমাস আগে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইন্দিরাজি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাক সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও হত্যালীলার বিবরণ দেন। ওই সময় ভারত ১ কোটি অত্যাচারিত ও বিপন্ন শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। আমেরিকা প্রায় সরাসরি এই গণহত্যাকে সমর্থন করছিল।

নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন এসে ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎ করেন। দিনটা ছিল ৯ নভেম্বর, ১৯৭১। নিক্সন ইচ্ছাকৃতভাবে ৪৫ মিনিট দেরিতে আলোচনায় এসে বলেন পাকিস্তান ভেঙে যায় এরকম কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া

খানের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন কী করা যায়। তবে ভারত যেন পাকিস্তানকে আক্রমণ না করে।তা করলে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবেনা। কিসিঞ্জারের পর্যবেক্ষণ, ইন্দিরা গান্ধি নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে নিক্সনের কথা শোনেন।

এরপর ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে ও ভারত অগ্রসর হচ্ছে শুনে নিক্সন তর্জন গর্জন শুরু করেন। বলেন 'এই মহিলা আমাদের প্রতারিত করেছেন।' নিক্সনের নির্দেশে ৬ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার ইন্দিরা গান্ধিকে ফোন করে সেনা প্রত্যাহার করতে বললে তিনি বলেন 'এই বিষয়ে কারও উপদেশ দেওয়ার দরকার নেই।' কিসিঞ্জারের বক্তব্য এই বিবরণ শুনে নিক্সন আর কোনও কথা বলতে পারেননি ও তোতলাতে থাকেন।

দ্বিতীয় বইটি 'দি ব্লাড টেলিগ্রাম, নিক্সন, কিসিঞ্জার এন্ড এ জেনোসাইড' বইটির লেখক প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গ্যারি জে ব্যাস। এই বইটিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাকাণ্ড শুরু হবার পর ঢাকায় নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্চার ব্লাড যে টেলিগ্রাম ও তার সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণপাঠ আছে। আছে বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন-পাক-চীন আঁতাতের বিবরণ।এই রাষ্ট্রদূত ব্লাডের রিপোর্টে খান সেনাদের গণহত্যার বিবরণ আছে। অধ্যাপক গ্যারি লিখেছেন বাংলাদেশের ঘটনায় আমেরিকা ও ভারত, এই দুই গণতান্ত্রিক দেশ দুই রকম ভূমিকা নিয়েছিল। আমেরিকা পাক গণহত্যাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল, আর ভারত তার অবসান ঘটিয়েছিল। অবশ্যই ইন্দিরা গান্ধির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। ইন্দিরা গান্ধির ওপর কেন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশি বিদেশি অনুচররা ক্রুদ্ধ হয়েছিল তা না বোঝার কারণ নেই।

গত২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, নিউ ইয়র্ক টাইমস অধ্যাপক গ্যারি ব্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। গ্যারি ব্যাস এর আগে তাঁর 'দি ব্লাড টেলিগ্রাম'-এ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়ার ডিপ্লোম্যাসি' সম্পর্কে বিস্তৃত লিখেছেন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর্কাইভ থেকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন -এর কথোপকথনের কিছু টেপ রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। গ্যারি ব্যাস লিখেছেন, এতে শোনা যাচ্ছে নিক্সন বিভিন্ন সময়ে বলছেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় মহিলারা ভীষণ ভাবে অনাকর্ষণীয়, তাদের কোনও যৌণ আবেদন নেই এবং তারা অত্যন্ত বিরক্তিকর। নিক্সন সম্পর্কে এটাও জানা গিয়েছে যে লোকটি অত্যন্ত ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও তাঁর বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন একজন ইহুদী। নাৎসিদের ইহুদী নিধনের সময় ইহুদীরা ছিলেন চরম অত্যাচারিত। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা বাংলাদেশে পাকিস্তানের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, ইন্দিরা গান্ধি তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁর ওপর নিক্সন ও কিসিঞ্জার জুটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়।

ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে এই দুই ক্ষমতাবান মার্কিনীর যে বিদ্বেষ তার পিছনে ব্যক্তিগত রসায়ন থাকতে পারে বলে গ্যারি ব্যাস অনুমান করেছেন। সাধারণভাবে ভারতীয়দের ও বিশেষভাবে ভারতীয় মহিলাদের সম্পর্কে নিক্সনের যে বিদ্বেষ তার কারণ তাঁর ইন্দিরা গান্ধির ওপর ক্রোধ। ইন্দিরার নেতৃত্বে ভারতের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ও বাংলাদেশের ঘটনায় পাকিস্তানের বিরোধীতা ছিল নিক্সনের বিদেশনীতির পরিপন্থী।

গ্যারি ব্যাস একটি অসাধারণ কাহিনীর কথা বলেছেন।১৯৬০ সালে নিক্সন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে জন. এফ. কেনেডির বিরুদ্ধে লড়ে হেরে যান। তারপর নিক্সন একবার ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদে দাঁড়িয়েও হারেন। আবার ভাগ্য পরীক্ষার আগে তিনি ভারতে আসেন ও সদ্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। মিনিট কুড়ির সাক্ষাৎকারে কিছুক্ষণ পরেই ইন্দিরা গান্ধি বিরক্ত হন ও আগ্রহ হারান। তিনি তাঁর এক সচিবকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করেন এই বিরক্তিকর সাক্ষাৎ কখন শেষ হবে। গ্যারি ব্যাসের মতে একদম ঠিক মানে বুঝতে না পারলেও, নিক্সন প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরের মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যালীলার বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতের প্রতিবাদ নিক্সনকে ক্ষুব্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সমর্থন, ইয়াহিয়া খান ও হেনরি কিসিঞ্জারের দৌত্য মার্কিন - চিন আঁতাতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাক - ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোতে থাকলে ২০ টি রুশ রণতরী তার পিছু নেয়। এর পরই সপ্তম নৌবহর তাদের গতিমুখ ঘুরিয়ে নেয়। ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ পাক সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিয়াজি ঢাকায় ভারতীয় কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা ও মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

বাংলাদেশে পাক সেনাদের পরাজয় ছিল কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়। আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের এই পরাজয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রবল উৎসাহিত করে। ১৯৭৫ সালের ১ মে দক্ষিণ ভিয়েতনাম মুক্ত হয়। একই সঙ্গে মুক্ত হয় কম্বোডিয়া ও লাওস।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তির সন্ধানে

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

আজ থেকে ৮৫ বছর আগে উগ্র জাতীয়তাবাদের তথা ইহুদি বিদ্বেষবাদের পতাকা তুলে কি ভাবে নাৎসী জার্মানী ইউরোপের বুকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ছিল এবং সেই যুদ্ধের দাবানলে গোটা বিশ্ব পুড়েছিল, ঠিক সেইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে উগ্র জাতীয়তাবাদ তথা মুসলিম বিদ্বেষবাদের পতাকা তুলে ইসরায়েল আজ মধ্যপ্রাচ্যে সর্ব্বনাশা যুদ্ধের আগুন জ্বেলেছে এবং সেই আগুন সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমেরিকা--ইসরায়েলের এই রক্তহোলি খেলার নেশা সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে - এটাই হোক সকলের এক আওয়াজ।

কবিগুরুর কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'- এটাই এখন প্রত্যেক মানুষের মনের কথা। কোন মানুষই মরতে চায় না। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুরে প্রকাশ্যে - অপ্রকাশ্যে সব মানুষই বলতে চায়, 'তোমার দেওয়া এই বিপুল পৃথিবী সকলে করিব ভোগ।' কিন্তু, তবুও আমরা দেখছি যে নির্বিচারে বছরের পর বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার ইসরায়েলের হাতে মানুষ মরছে। তবু মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ কিন্তু দমছে না। বরং, জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্যকরে মানুষ সেখানে সংগ্রাম করছে। প্রতিদিন অগণিত স্ত্রী হারাচ্ছে তাদের স্বামীকে, স্বামীরা হারাচ্ছে তাদের স্ত্রীকে, বাবা মা হারাচ্ছে তাদের সন্তানকে।

তবু, লোহিত সাগরের তীরে, জর্ডানের কূলে, গাজার প্রান্তরে দাঁতে দাঁত চেপে, চোখের জলকে জ্বালানী বানিয়ে মানুষ লড়ছে। আসলে এই মানুষগুলি মানবতার পক্ষে লড়ছে, শান্তির লক্ষ্যে লড়ছে, ধ্বংসের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে, জীবনের পক্ষে, সৃজনের স্বার্থে লড়ছে। অনেকে ভাবের ঘরে চুরি করেন। তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের বিবাদমান পক্ষগুলিকে, অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইসরায়েলী আগ্রাসনবাদ এবং এদের পাশাপাশি ইরাণ - ইয়েমেন -লেবানন- প্যালেস্টাইনের সামরিক পদক্ষেপকে একাকার করে দেখছেন। কিন্তু, এটা মোটেও যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দুটো মোটেও এক বস্তু নয়। এক হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ভাবাদর্শকে এখানে তুলে ধরতে চাই। জাতিপুঞ্জের সনদে যুদ্ধকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে 'aggressive war' বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ এবং 'defensive war' বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। এই সনদ অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বৈধ। অবৈধ হোল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের সনদে যৌথ নিরাপত্তা বা 'Collective Security'-র কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে, আক্রান্ত দেশের পক্ষে সমস্ত দেশ যৌথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।

আজকের মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করতে গেলে জাতিপুঞ্জের সনদের এই আলোকে সকলকে তা করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে আজ বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং এই আঞ্চলিক যুদ্ধ বা 'Regional war' একটি বিশ্বযুদ্ধ বা 'World war' - এর চেহারা নিতে পারে। কিন্তু কথা হোল যে মধ্যপ্রাচ্যে এই বিধ্বংসী যুদ্ধের আবহে প্রকৃতপক্ষে আক্রমণকারী কে এবং আক্রান্তই বা কে? একথা বলার কোনও অপেক্ষাই রাখে না যে মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণকারী হোল মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরায়েল। আর আক্রান্ত হচ্ছেন প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী জনগণ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারে বারে ঘোষণা করেছে যে মার্কিন মদতপুষ্ট ইসরায়েলই হোল আক্রমণকারী, আর প্যালেস্টাইনী জনগণ হোল আক্রান্ত।

এতে আমেরিকা-ইসরায়েল খুবই অসন্তুষ্ট জাতিপুঞ্জের উপরে। জাতিপুঞ্জের কোন কর্মকর্তাকে ইসরায়েল তার ভূখণ্ডে ঢুকতে দিচ্ছে না। এমনকি জাতিপুঞ্জের মহাসচিব এ্যান্তনিও গুতারেসকে ইসরায়েল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকেও সে চ্যালেঞ্জ করছে। কারণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার মহাসচিব গুতারেস প্যালেস্টাইনবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করছেন। বিশ্বের একশ ছেচল্লিশটি দেশ প্যালেস্টাইনকে সার্ব্বভৌম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নরওয়ে সহ ইউরোপের তিনটি দেশ তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বীকৃতি দেয়নি উগ্র মুসলিম মৌলবাদীদের সমর্থনপুষ্ট তথা মার্কিন উচ্ছিষ্টভোগী বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথা তার প্রধান ইউনুস।

আর দুর্ভাগ্যের কথা হোল যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বরাবর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশে থেকেছে। কি ১৯৬০ সালের কঙ্গোর প্রশ্নে, ভিয়েৎনাম প্রশ্নে, বাংলাদেশ প্রশ্নে, সব সময়ই আমাদের জনগণ ও সরকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশে থেকেছে। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষায়, 'Where freedom is menaced and justice threatened - we cannot be and shall not be neutral.' অর্থাৎ স্বাধীনতা যেখানে বিপন্ন, মানব অধিকার যেখানে পদদলিত, সেখানে আমরা নির্লিপ্ত থাকতে পারি না, নির্লিপ্ত থাকবো না। বস্তুতঃপক্ষে, এযাবৎকালের যাবতীয় ভারত সরকার প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের পাশে থেকেছে। নরেন্দ্রমোদী সরকারই তার ব্যতিক্রম। এই সরকার প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল--মার্কিন জোটের নির্বিচার গণহত্যাকে মদত করছে। এটা আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদেশ নীতির পরিপন্থী।

আমরা বিশ্বাস করি যে বিশ্বজনমতের চাপ তথা ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মেজাজের চাপ মোদী সরকারকে বাধ্য করবে এই ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আসতে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ইরাণ, লেবালন, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশ রণাঙ্গনে এসে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের দালাল কিছু লোক সংকীর্ণ ধর্মীয় মৌলবাদী দৃষ্টিকোণে কুৎসা করছে যে 'মুসলমানরা সব এক হয়ে জাতের টান টানছে।' এটা একটা বর্বরসুলভ মন্তব্য। মধ্যপ্রাচ্যে 'মুসলমানরা সব এক হয়ে জাতের টান টানছে' না। তা যদি হবে তাহলে ঢাকার মসনদে বলে থাকা ঐ মার্কিন দালালটা (ইউনুস) কি? ওটা কি হিন্দু? না বৌদ্ধ? না খৃশ্চান? ওটা কি তথাকথিত ধর্মসূত্রে মুসলিম নয়?

আসলে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃশ্চান- কোন জাতের বা ধর্মের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হোল মানবতাবাদের। প্রশ্নটা হোল মানুষ নামক জাতের। আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়--

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'

'মুসলমান' নয়, খৃশ্চান নয়, বৌদ্ধ নয়। মানুষ নামক এই জাতিটার অস্তিত্ব আজ মার্কিন-মদতপুষ্ট ইসরায়েলী আক্রমণে বিপন্ন। এই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের স্বপক্ষে জাতিপুঞ্জের সনদের যৌথ নিরাপত্তা বা 'Collective Security'-র নীতির ভাবাদর্শে ইরাণসহ বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিভিন্ন দেশ আগ্রাসী ইসরায়েল - আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রান্ত প্যালেস্টাইনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে আরও বিভিন্ন দেশ তার পাশে এসে দাঁড়াবে। তার পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে , ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন League of Nations ও নেই, আবার United Nations ও উদ্ভূত হয়নি। কিন্তু যৌথ নিরাপত্তার আদর্শ তখন মানুষের ভাবাদর্শের জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারই ভিত্তিতে বিশ্ববাসী সহ সারা পৃথিবীর নাৎসী বিরোধী- ফ্যাসিবিরোধী দেশসমূহ আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আজ সারা পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশ জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তা নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যালেস্টাইন মুক্তিসংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে ও দাঁড়াচ্ছে। বিশেষতঃ, শিয়া-সুন্নি বিরোধের সুযোগে ইরাণ--ইরাক বিভাজন তৈরী করে ওয়াশিংটন সাদ্দাম হোসেনকে অপসারিত করে খুন করেছিল ও মধ্যপ্রাচ্যকে নিষ্কন্টক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিয়া-সুন্নি প্রধান ইরাণ-ইরাক বোঝাপড়া সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওরা আজ আরও মরীয়া। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলী-মার্কিন হানার তীব্রতা তারই প্রমাণ। এ ওদের দোজক যাত্রার, নরক যাত্রার পূর্বাভাষ। ভিয়েৎনাম, বাংলাদেশ, সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদীরা এটা করেছিল, মধ্য প্রাচ্যেও ওরা তাই করছে। কিন্তু, পারবে না। ওদের পরজয় ও মানবতার জয় অবশ্যম্ভাবী। শুধু সময়ের কিছু অপেক্ষা।

লেখক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কোলকাতা সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়

অতুল চন্দ্র, বিজয় প্রসাদ

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল আরাগালয়া (প্রতিবাদ) যার পরিণতিতে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষেকে তড়িঘড়ি দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এই প্রতিবাদের কারণ ছিল দেশের-মানুষের অর্থনৈতিক সম্বলহীনতা; জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব তাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রতিবাদী মানুষের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত না-করে; নয়া-উদারবাদী ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা বিক্রমসিংঘে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন রাজাপক্ষের ৬ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করার জন্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিক্রমসিংঘের অপদার্থ শাসনকাল ওই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত কারণগুলির কোনও সমাধান করেনি।

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শ্রীলঙ্কার নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের তরফে ঘোষণা হল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন জনতা বিমুক্তি পেরামুনার (জেভিপি)-র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপ)-র প্রার্থী অনুরা কুমার দিশানায়েকে। ২০১৪ সাল থেকে বামপন্থী রাজনৈতিক দল জেভিপি-র নেতৃত্বে থাকা দিশানায়েকে ৩৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেছেন যার মধ্যে রয়েছে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির রনিল বিক্রমসিংঘে এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমাগি জন বালাওয়েগাভার সাজিথ প্রেমাদাসা। শ্রীলঙ্কা পড়ুজন পেরামুনা (এসএলপিপি) এবং ইউএনপি-র মতো শ্রীলঙ্কার পরম্পরাগত রাজনৈতিক দলগুলি যারা এতদিন প্রভাব বিস্তার করে এসেছে রাজনীতিতে তারা পেছনে পড়ে গেছে যদিও শ্রীলঙ্কার সংসদে এখনও তাদেরই প্রাধান্য (মোট ২২৫ টি আসনের মধ্যে এসএলপিপি ১০৫টি আর ইউএনপি ৩টি আসন)। দিশানায়েকের দল জেভিপি-র সংসদে আসন রয়েছে মাত্র ৩টি।

দেশের নবম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দিশানায়েকের বিজয় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এবারই প্রথম দেশের মার্কসবাদী ধারার একটি দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করল। ১৯৬৮ সালে জন্ম 'একেডি' নামে পরিচিত দিশানায়েকে কলম্বো থেকে অনেক দূরের উত্তর-মধ্য শ্রীলঙ্কার শ্রমিক পরিবারের সন্তান। শ্রীলঙ্কার ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব ও জেভিপি-র একজন কর্মী হিসেবে কর্মরত থাকার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গের ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ অবধি রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে জেভিপি-র সাথে আঁতাত গড়ে উঠলে দিশানায়েকে সংসদের

সদস্য নির্বাচিত হন। কুমারাতুঙ্গের মন্ত্রীসভায় দিশানায়েকে ছিলেন কৃষি, ভূমি এবং পশুসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী যে-পদে থাকার সুবাদে প্রশাসক হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের পাশাপাশি কৃষি-সংস্কার নিয়ে বিতর্কে জনগনকে শামিল করতে সমর্থ হন (রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আবার এটি মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি আরেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিফল হয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্যে দিশানায়েকে বা এনপিপি দমে যায়নি।

আমাদের বিজয় সমাবেশের অঙ্গ হিসেবে গতকাল রিদিগামা সমাবেশে (১৭) যোগ দিলাম। দেশকে এক নতুন নবজাগরণ ও 'সমৃদ্ধ দেশ, সুন্দর জীবন' আদর্শের পথে চালিত করার লক্ষ্যে আপনাদের উপস্থিতি ও ২০২৪-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন সত্যিই প্রশংসনীয়!

অর্থনৈতিক অস্থিরতা ঃ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল আরাগালয়া (প্রতিবাদ) যার পরিণতিতে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষেকে তড়িঘড়ি দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এই প্রতিবাদের কারণ ছিল দেশের-মানুষের অর্থনৈতিক সম্বলহীনতা; জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব তাদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক ঋণ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রতিবাদী মানুষের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত না-করে; নয়া-উদারবাদী ও পাশ্চাত্য ঘেঁষা বিক্রমসিংঘে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন রাজাপক্ষের ৬ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করার জন্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিক্রমসিংঘের অপদার্থ শাসনকাল ওই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত কারণগুলির কোনও সমাধান করেনি। ২০০৩ সালে শ্রীলঙ্কাকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দুয়ারে দাঁড় করিয়েছে ২.৯ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা অনুদানের জন্যে (১৯৬৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কাছ থেকে নেওয়া এটা ১৭ নম্বর অনুদান) যার জেরে বিদ্যুতের মতো সামগ্রীর উপর থেকে ভরতুকি প্রত্যাহার করা হয় এবং ১চু-র ওপর দ্বিগুন হারে বাড়তি মূল্যযুক্ত কর যোগ করা হয়। এই ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে কোনও বাইরের ঋণদাতাকে নয়, শ্রীলঙ্কার শ্রমিক শ্রেণিকেই। দিশানায়েকে বলেছেন তিনি এই বন্দোবস্ত উল্টে দেবেন এবং চুক্তির পর্যালোচনার মাধ্যমে বাইরের ঋণদাতাদের ওপর অধিকতর দায়িত্ব চাপাবেন, আয়করের সীমা বৃদ্ধি করবেন এবং একাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে (খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার) বাড়তি করের আওতার বাইরে নিয়ে আসবেন। দিশানায়েকে যদি সত্যিই এই কাজ করতে পারেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমনে হস্তক্ষেপ করেন, তবে গৃহযুদ্ধ-ক্লান্ত ও রাজনীতির কুলীন কূলের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে সমর্থ হবেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে এখন একটি মার্কসবাদী দল ঃ ১৯৬৫ সালে একটি মার্কবাদী লেনিনবাদী দল হিসেবে জেভিপি বা গণমুক্তি ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা। রোহানা উইজেউইরার (১৯৪৩-১৯৮৯) নেতৃত্বে এই দল ১৯৭১ ও ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯-এ দু-বার অন্যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণাতীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। দুটি অভ্যুত্থানই নৃশংসভাবে দমন করে রাষ্ট্র যার ফলে উইজেউইরা সহ হাজার হাজার সদস্যের হত্যার ঘটনা ঘটে। ১৯৮৯ সালের পর জেভিপি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রবেশ করে। জেভিপিতে দিশানায়েকের পূর্বসূরী নেতা সোমাওয়ানসা আমেরাসিংঘে (১৯৪৩-২০১৬) আটের দশকের শেষে দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের হত্যার ঘটনার পর দলকে পুনর্গঠন করেন। নির্বাচনী সংগ্রাম ও সামাজিক ক্ষেত্রের লড়াইয়ে সমাজতান্ত্রিক নীতির স্বপক্ষে দলকে একটি বামপন্থী দল হিসেবে গড়ার কাজটি এরপর গ্রহণ করেন দিশানায়েকে। জেভিপি-র এই চমকপ্রদ অগ্রগতিটি দিশানায়েকের প্রজন্মের অবদান; যারা বয়সে দলের প্রতিষ্ঠাতাদের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোটো এবং যারা শ্রীলঙ্কার শ্রমজীবী জনগণ ও দরিদ্রতর মানুষের মধ্যে দলের আদর্শগত ভিত্তি প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে দলের কিছু কিছু নেতার সিংহলী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার (বিশেষ করে যখন এলটিটিই-র জঙ্গি কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন এসেছে) প্রবণতার প্রেক্ষিতে তামিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে দলের সম্পর্কের প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে। স্বজনপোষণে ডুবে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শাসকবর্গের সম্পূর্ণ বিপরীতে দিশানায়েকের ব্যক্তিগত সততা ও জাতিগত বিভাজনের দৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিকে পরিচালনা করতে চাওয়ার মানসিকতাই ব্যক্তি হিসেবে তাঁর এই উত্থানের প্রধান কারণ।

বাম সংকীর্ণতাবাদের প্রত্যাখানও জেভিপির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অংশত একটি কারণ। একুশটি বাম ও মধ্য-বাম সংগঠনকে নিয়ে পার্টি ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) জোটটি গঠন করেছে যাদের অভিন্ন কর্মসূচি হচ্ছে শ্রীলঙ্কার জনগনের বৃহত্তর অংশের স্বার্থে দুর্নীতি ও আইএমএফ-এর ঋণ ও ব্যয় সংকোচের নীতির মোকাবিলা করা। এনপিপি-র কিছু কিছু অংশীদারদের মধ্যে তীব্র নীতিগত মতপার্থক্য থাকলেও রাজনীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে অভিন্ন কর্মসূচির প্রতি দায়বদ্ধতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি স্বনির্ভরতা, শিল্পায়ন ও কৃষি সংস্কারের অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এনপিপি-র প্রধান শক্তি হিসেবে জেভিপি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির (বিশেষ করে জ্বালানি ব্যবস্থাপনার মতো জরুরি ক্ষেত্র) জাতীয়করণ ও প্রগতিবাদী করারোপ ও সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বন্টনের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। জাতিগত

সংঘাতে বিদীর্ণ শ্রীলঙ্কার সমাজে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের এই বার্তাটি সাদরে গৃহীত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের এই কর্মসূচিটি কতটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন দিশানায়েকে সেটাই আগামী দিনে দেখার। তবে তাঁর বিজয় নিশ্চিতভাবেই নতুন প্রজন্মের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছে যারা অনুভব করতে পারছে যে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের অবসন্ন প্রকল্প ছাড়াও দেশ এগোতে পারে এবং শ্রীলঙ্কাকে এমন একটি পথে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টাটি দক্ষিণ গোলার্ধের রাজনীতিতে একটি আদর্শ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

মার্কসবাদী পথের সৌজন্যে প্রাপ্ত। লেখকদের দু'জনেই ট্রাইকন্টিনেন্টাল ইনস্টিট্যুট ফর সোসাল রিসার্চের সাথে যুক্ত। অনুবাদ- শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

ইতিহাসের অনাচার : সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন

মজিবুর রহমান

ইতিহাসের জনক গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৫) তাঁর গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে সামরিক সংঘাত নিয়ে লিখিত পুস্তকের নামকরণ করেন 'হিস্টোরিয়া' (Historia), যার অর্থ সত্যের অনুসন্ধান। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গ্রীক 'হিস্টোরিয়া' থেকেই ইংরেজি 'হিস্ট্রি' (History) উদ্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষায় 'ইতিহাস' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করে পাওয়া যায়- ইতি+আস। 'ইতিহ' শব্দের অর্থ ঐতিহ্য; অতীতের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, এককথায় জীবনচর্চা যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে তাকেই ঐতিহ্য বলে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। অতীত ছাড়া বর্তমানের নির্মাণ সম্পূর্ণতা লাভ করে না।তাই ইতিহাসের মাধ্যমে অতীত দিনের কথা জানা জরুরি। কিন্তু যেকোনও ঘটনাকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ থাকে বলে একই ঘটনার নানান ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব। এখানেই ইতিহাসের মজা; ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কখনও তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটে না। কিন্তু সমস্ত যুক্তি-পাল্টা যুক্তির প্রর্দশন সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে হওয়া উচিত।পুরনো দিনের বিকৃত, বিদ্বেষপূর্ণ ঘটনার ঘনঘটা বর্তমান সময়ের সম্প্রীতি নষ্ট এবং ভবিষ্যতে সদ্ভাব সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের ইতিহাস চর্চায় সচেতন ভাবে সত্যের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে।লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই ইতিহাস বিকৃতির জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পাশাপাশি দেশীয় ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই মূলত দায়ী। সব সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে যথাসম্ভব সহজ, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ রাখতে ইতিহাসের এই অনাচার বন্ধ হওয়া দরকার। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্য ইতিহাসের দু-চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিকৃতি তথা মিথ্যাচারের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন দীর্ঘদিন ভারত শাসন করেছে তেমনি ভারতের প্রচলিত ইতিহাসও তারাই রচনা করেছে। বিভ্রাট বা বিকৃতির সূত্রপাতও সেখান থেকেই। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিলের (১৭৭৩-১৮৩৬) একটি বিখ্যাত বই 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'। প্রায় বারো বছর ধরে লেখা মিলের এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, মিল কখনও ভারতে আসেননি। ভারত ভ্রমণ না করেই ভারতের একটা আস্ত ইতিহাস লিখে ফেলেন তিনি! এই গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ। অর্থাৎ, প্রথম দুটি পর্যায়ের নামকরণ শাসকের ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে আর তৃতীয়টি শাসকের জাতির নামে। এই ত্রুটিপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পর্ব-বিভাজনে ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতকে হিন্দু ও মুসলিম যুগে দ্বি-বিভাজিত করে ভারতের বহুধর্মীয় চরিত্রকে অস্বীকার করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, তথাকথিত হিন্দু যুগেও (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ) মৌর্য, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু অহিন্দু রাজবংশের প্রবল অস্তিত্ব ছিল। এখানে 'হিন্দু' শব্দের উদ্ভব নিয়ে দু-এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু নদের উপকূলে বাণিজ্য করতে আসে। আরবিভাষীদের মুখে সাধারণত 'স'-এর উচ্চারণ হয় 'হ'। সেজন্য ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের আরবের বণিকরা 'হিন্দু' বলে অভিহিত করতো। সেই হিসেবে 'হিন্দু' শব্দটির উদ্ভবে মুসলমানদের অবদানই বেশি। সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের বোঝাতে হিন্দু শব্দের ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মিলের পর্ব-বিভাজনে মুসলিম শাসনে ভারতীয় উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান প্রজা তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও তাদের সামাজিক প্রভাবের কথা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তিকর পর্ব-বিভাজনকে পরিবর্তন করে এখনকার পাঠ্যপুস্তকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ করা হয়েছে।এটি অবশ্যই একটি সঠিক পদক্ষেপ।

স্যার যদুনাথ সরকার ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ মূল ধারার ভারতীয় ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের মুসলিম শাসনকে 'বিদেশি শাসন' হিসেবে অভিহিত করেন। সেই ধারা অনুসরণ করে আজও অনেকেই মুসলমানদের ষোলো আনা স্বদেশী হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি করে। একটা ঐতিহ্যশালী জনগোষ্ঠীকে কোনো ভূখণ্ডে কয়েক শতাব্দী ধরে বসবাস করার পরও 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস'-এ ভুগতে হলে তা যেমন সেই জনগোষ্ঠীকে হতাশ করে তেমনি সেই ভূখণ্ডকেও দুর্বল করে।

তুর্কি, পাঠান, মোঘল প্রভৃতি বহিরাগত মুসলিম শাসকেরা ভারত বিজয়ের পর কিন্তু তাদের পুরনো স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেনি। উপমহাদেশেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে।কবির কথায় তারা 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে... এক দেহে লীন' হয়ে গিয়েছিল। তাহলে তাদের আর বিদেশী বলা হবে কেন? আর্যরাও উপমহাদেশের আদি বাসিন্দা নয়। তারা বাইরে থেকে এই ভূখণ্ডে এসেছিল। কিন্তু তাদের তো বিদেশী বলা হয় না! আত্মীয়কে অনাত্মীয় মনে করলে মানসিক দূরত্ব বাড়ে; ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামের প্রসারের পেছনে একটি বহুল প্রচারিত ভাষ্য হল - এক হাতে কোরান অন্য হাতে তরবারি। তাই প্রতিহিংসার অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে আজও মুসলমানদের প্রতি ফতোয়া নিক্ষিপ্ত হয় - কোরান ছাড়ো না হয় ভারত ছাড়ো। কিন্তু মুসলিম শাসকের সাথে ইসলাম ধর্মকে অভিন্ন করে দেখার মধ্যেই একটা অসঙ্গতি রয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, সরাসরি ইসলাম ধর্মের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আরব দুনিয়ায় যুদ্ধ হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। সেই সব যুদ্ধে পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ এবং তাঁর অনুগামী মক্কা-মদিনার খলিফারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেগুলোই ছিল ইসলামের ধর্মযুদ্ধ। পরবর্তী কালে সংঘটিত আর কোনও যুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি ধর্মের যোগ নেই। মধ্যযুগে বিদেশি মুসলিম শাসক, সম্রাট বা সুলতানরা কেউই এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেননি। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাধারণ লক্ষ্য নিয়েই তাঁরা এই এলাকা আক্রমণ করেছেন।আরব দুনিয়ার মতো এখানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। ধর্মগ্রন্থ সংবিধানের জায়গা দখল করেনি। দৈনন্দিনকার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসকদের নিষ্ঠা সহকারে ইসলামী রীতি বা শরিয়ত অনুসরণ করতে দেখা যায়নি।ব্যক্তিগত জীবনে যিনি যতটুকু পেরেছেন ধর্ম পালন করেছেন। ধর্মবিরোধী অনেক কাজও করেছেন তাঁরা।কাজেই, এক হাতে কোরান অন্য হাতে তরবারি- এই ভাষ্যের মধ্যেই একটা ভ্রান্তি রয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু প্রাণ হারিয়েছিলেন - এমন বক্তব্যও ঠিক নয়। আবার, মুণ্ডচ্ছেদের ভয়ে এই অঞ্চলের মানুষেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলমান হয়েছিলেন- এমন ব্যাখ্যারও যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি নেই। বিপান চন্দ্র, রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, ইরফান হাবিব প্রমুখ ঐতিহাসিকের গবেষণা প্রমাণ করেছে, তুর্কিদের ভারত অভিযানের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। বরং নতুন শাসনব্যবস্থার নিম্নস্তরে স্থানীয় হিন্দুরা আগের মতোই যুক্ত থেকেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল বলেই বহিরাগত বিধর্মীদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথাই মূলত এর জন্য দায়ী। সেই সময় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধর্মপালনের কার্যত কোনো অধিকারই ছিল না।বেদ পাঠ করা তো বটেই এমনকি তা শ্রবণ করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। বেদ পড়ার 'অপরাধে' তথাকথিত ছোট জাতের জিভ কেটে নেওয়া এবং বেদপাঠ শুনলে কানে উত্তপ্ত শিসা ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো অত্যন্ত কঠিন শাস্তি প্রচলিত ছিল। হিন্দু সমাজে তাদের স্থান ছিল খুবই অমর্যাদার। একেবারে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হত তারা। চরম অপমান, উপেক্ষা ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে প্রধানত নিম্নবর্ণের শূদ্ররাই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে জাতপাতমুক্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এজন্য হিন্দু ধর্মের সুবিধাভোগী অংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মুসলমান হওয়ার তেমন দৃষ্টান্ত নেই। শুধু অন্তজ্য শ্রেণীর হিন্দু নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকও ইসলামের আশ্রয় নেয়। মৌলভীর দাড়ি, পুরোহিতের টিকির মতো বৌদ্ধ পণ্ডিতরা সাধারণত মুণ্ডিত মস্তক হতেন। এজন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাদের পরিচয় হত 'নেড়ে মুসলমান'। সেই সূত্রেই মুসলমানদের গালি দেওয়ার জন্য আজও 'ম্লেচ্ছ', 'যবন'-এর সঙ্গে 'নেড়ে' কথাটা ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা প্রাচীন ও মধ্যযুগ পার করে আধুনিক যুগেও সক্রিয় রয়েছে। হরিজনদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপকার ডঃ বি আর আম্বেদকরের হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার কথাও সকলের জানা। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও আদিবাসী ও দলিতদের খ্রিস্টান হওয়ার খবর পাওয়া যায়। স্বসম্প্রদায়ের পীড়ন আর ভিন সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবিক ব্যবহার পাওয়ার ফলেই সাধারণত ধর্মান্তকরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদীরা 'ঘর ওয়াপসি'র নামে কিছুটা জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচলিত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে একটি সরল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়- মুসলিম শাসনে প্রচুর মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল।তাই কয়েক শতাব্দী পূর্বে রাজতন্ত্রের যুগে তথাকথিত মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে আজকের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র চলে। আর, বিজ্ঞান প্রযুক্তির আধুনিক যুগে মসজিদ-মন্দিরের ধর্মীয় বেড়াজালে ভারতীয় সভ্যতা আটকে থাকে। অর্ধসত্য কখনও কখনও ডাহা মিথ্যার থেকেও ক্ষতিকর হতে পারে। মুসলমান আমলে মন্দির ধ্বংসের অভিযোগের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। ঘটনা হল, অভিযুক্ত শাসকেরা যেমন মন্দির ভেঙেছেন তেমনি মসজিদ, মঠও ভেঙেছেন। মন্দির, মসজিদ ও মঠ নির্মাণে রাষ্ট্রের তরফে ভূমিদান ও অর্থসাহায্য করার দৃষ্টান্তও রয়েছে।

মুসলমান শাসকদের মতো হিন্দু শাসকদেরও ধর্মশালা নিয়ে কমবেশি একই নীতি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। যেমন, কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষদেব (রাজত্বকাল ১০৮৯-১১০১) 'দেবোৎপাটন নায়ক' নামক একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের দায়িত্ব ছিল হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি লুণ্ঠন বা ধ্বংস করা। আসলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে রাজা-বাদশারা ধর্মস্থানে আঘাত হেনেছিলেন মূলত আর্থিক, সামরিক বা রাজনৈতিক কারণে; ধর্মীয় কারণ নিতান্তই গৌণ ছিল। তখনকার দিনে বিভিন্ন মঠ-মন্দির-মসজিদে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হিসাব বহির্ভূত ধনসম্পদ এবং বেআইনি অস্ত্র লুকিয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। স্বাভাবিক কারণেই সেগুলোর বিরুদ্ধে শাসকেরা কড়া পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জার্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বাধীন বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তান আন্দোলন দমন করার জন্য ১৯৮৪ সালের জুন মাসে শিখ ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান পাঞ্জাবের অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযান চালানো হয়, যার পোশাকি নাম ছিল 'অপারেশন ব্লু স্টার'। শিখ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়, দেশের অখন্ডতা রক্ষার স্বার্থেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এই পদক্ষেপ করতে হয়েছিল। অবশ্য জুন মাসের ঐ সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়াতেই ৩১শে অক্টোবর শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে শ্রীমতী গান্ধী প্রাণ হারান।

আমাদের ইতিহাস বইগুলোতে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে (২৫.১২.১৮৭৬ - ১১.৯.১৯৪৮) কাঠগড়ায় তোলা হয়। কিন্তু উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক জাতিতে বিভক্ত করার প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের (২৮.৫.১৮৮৩-২৬.২.১৯৬৬) ভূমিকা নিয়ে কথা হয় না। মন্দের আলোচনা কম হওয়াই ভালো; কিন্তু সব দোষ কেবল নন্দ ঘোষের উপর চাপিয়ে দেওয়াও সঙ্গত নয়। মুসলিম লীগ যখন মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করছিল হিন্দু মহাসভা কি তখন মুসলমানমুক্ত ভারত পুনর্গঠনের ভাবনায় উজ্জীবিত ছিল না ? ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯০৬ সালে আর হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় ১৯১৫ সালে। স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ভিন সম্প্রদায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির অপচেষ্টাও চলতে থাকে। জিন্নাহ যখন কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯২০) মুসলিম লীগে যোগদান করছেন, তখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' (১৯২৩) প্রকাশ হচ্ছে। ৩০ ও ৪০-এর দশকে জিন্নাহ যখন পাকিস্তান পাওয়ার জন্য প্যাঁচ কষছেন, সাভারকার তখন ভারতে 'হিন্দুরাষ্ট্র দর্শন'-এর পাঁক ঘাঁটছেন। জিন্নাহরা খুশি হয়েছেন হিন্দুদের প্রভাবমুক্ত পাকিস্তান পেয়ে আর সাভারকাররা খুশি হয়েছেন হীনবল মুসলমান সহ ভারত পেয়ে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এখনও মাঝেমধ্যে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুটি ঠিকানার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়- পাকিস্তান না হয় গোরস্তান। পাকিস্তান-বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরাও মুসলিম মৌলবাদীদের কাছ থেকে একই রকম ফতোয়া শুনতে অভ্যস্ত- শ্মশান না হয় হিন্দুস্তান।

সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগায় এমন উপাদানকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা দরকার। বর্তমানকে বিব্রত করে এমন অতীতকে অস্বীকার না করলেও তাকে আদর করা যায় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা দখল করা অথবা ধরে রাখার জন্য বিকৃত ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া অন্যায়। সকল ভারতবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত 'মহান ভারত' গড়ার রসদ সন্ধান। ভারতের ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যকে সমস্যা নয়, শক্তি ও সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করতে হবে। আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই মাতৃভূমির শক্তি ও সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

লেখকঃ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক , মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

ভিয়েতনামের ডায়েরি

সৌর বসু

---

(২)

৮ সেপ্টেম্বর

গতকাল সারাদিন হোটেল বন্দী ছিলাম। রাত ভোর বৃষ্টি হয়েছে, সেই সঙ্গে ঝড়। আজ সকালে মেঘ মুক্ত আকাশ। ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। কিছুদূর হাঁটলেই লেক। লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিপাশ দেখছি আর ছবি তুলছি।। ইতোমধ্যে একটি রিকশো এসে দাঁড়ালো। এখানে রিক্সা গুলোতে আরোহী চাপে সামনে চালক থাকে পিছনে। রিক্সাওয়ালাকে ডেকে বললাম শহর ঘুরতে যাব। কত পয়সা লাগবে। বলল ২ লক্ষ ডং। অর্থাৎ ৮ ডলারেরও বেশি। গতকাল বৃষ্টির মধ্যেই একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়েছিলাম, সেখানেও ৮ ডলার দিতে হয়েছিল। রিক্সাতেও আট ডলার। ভারি মজার ব্যাপার। যাই হোক দুজনে মিলে রিকশাতে চেপে বসলাম। আজকে গরম কম। রিকশো লেকের ধার দিয়ে রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল। পাশ দিয়ে অগুন্তি স্কুটারের স্রোত। কিছুটা যাবার পর দেখি রাস্তার ওপরে গাছ পড়ে রয়েছে। ঝড়ে গাছের শিকড় উপরে ফেলেছে। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওমা সর্বত্র রাস্তার উপরে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও বিশাল গাছকে উপরে ফেলা হয়েছে। ঝড়ের এই প্রচন্ড তান্ডব আমরা কিন্তু হোটেলে বসে টের পাইনি।

ধীরে ধীরে রিকশা এগিয়ে চলেছে, আমরাও চারিদিক দেখতে

দেখতে ছবি তুলে চলেছি। হ্যানয়ের রাস্তাঘাট বেশ চওড়া এবং পরিছন্ন। রাস্তার পাশে সুসজ্জিত দোকান। দু'ধারে কফি শপের ছড়াছড়ি।

ফুটপাতের উপরে চেয়ার টেবিল পাতা। সেখানে বসে তরুন তরুনীরা আড্ডা জমিয়েছে। দিনটা যে রবিবার ভুলেই গিয়েছিলাম।

ইউরোপে বিশেষ করে ইতালি তে দেখেছি রাস্তার ফুটপাতে আড্ডা নেমে এসেছে। ভিয়েতনামেও সেই একই ছবি। এখানে লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। অর্থাৎ রাস্তার ডান দিক ঘেঁষে গাড়ি চলাচল করে। ঠিক ভারতবর্ষের উল্টো। স্কুটার চালকদের সকলেরই মাথায় হেলমেট। গাড়ির চালক এবং সামনে আসনের আরোহী বেল্ট পরিহিত।। রাস্তায় কদাচিৎ গাড়ির হর্নের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এটা কি ইউরোপ নাকি আমেরিকা। এত সুশৃংখল ট্রাফিক চলাচল ভারতবর্ষে কোথাও দেখিনি। আমাদের দেশের রাস্তায় তো আকছার হর্ন বাজছে, ট্রাফিক নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে, হ্যানয়ের রাস্তাঘাটে কিন্তু সেসব চোখে পড়ল না।

ভিয়েতনামের শিক্ষিতের হার ভারতবর্ষের থেকে অনেক বেশি, প্রায় ৯৬ শতাংশে কাছাকাছি। মহিলাদের শিক্ষার হারও খুব বেশি। আগেই বলেছি এখানে বিভিন্ন কাজ কর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি করে চোখে পড়ে।। রাস্তায় বেরোলে সেটা চোখে পড়ে। হ্যানয় শহরটি বেশ সাজানো। উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া বাড়ির সংখ্যা কম।। ফরাসির স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন বেশ চোখে পড়ে। স্কুটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দামি দামি গাড়িও ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে।

রিক্সায় চড়ে বেড়াতে বেশ ভালো লাগছিল। বৃক্ষের ছায়া ঘেরা রাস্তা। রাস্তার দুপাশ দিয়ে তিনটি লেনে গাড়ি স্কুটার ছুটে চলেছে। রাস্তার মাঝ দিয়ে সারিবদ্ধ চীনা টগর গাছ। ছোট ছোট সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। শহরের মাঝে বেশ কয়েকটি বড় বড় লেক।

আমাদের রিকশা তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। কখনো রাজপথ, কখনো ছোট ছোট গলিপথ। বাজার এলাকায় বেশ ভিড়। দোকানগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা। ঘন্টা দেড়েক এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে রিক্সাওয়ালা যখন আমাদের লেকের সামনে এসে নামিয়ে দিল, তখন আকাশে আবার ঘোর ঘনঘটা। লেকের ধারে বেঞ্চে এসে বসলাম। চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো লোকজন বসে রয়েছে। সামনেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সেখানে সবুজ রংয়ের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। বড় বড় ব্যাটারী চালিত খোলা গাড়িতে, পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় আবার হুড খোলা দোতলা বাস চলছে।হপ অন, হপ অফ বাস। সেখানেও পর্যটকদের ভিড়। কিছুক্ষণ বসতে না বসতেই তোরে বৃষ্টি এলো। আমাদের সঙ্গে ছাতা ছিল, হোটেল থেকে পাওয়া গিয়েছিল। ছাতা খুলে জেব্রা ক্রসিং পেরিয়ে আমরা একটি কফি হাউসের নিচে এসে দাঁড়ালাম। লেকের পাশে বসে বসে কফি হাউসটা চোখে পড়েছিল। চারতলা অর্ধগোলাকৃতি একটি বিরাট বাড়ি, তার ব্যালকনিতে বসে খাবার সঙ্গে গল্প গুজব চলছে। বাড়িটি ফরাসি আমলের ।১৯৩০ এর দশকে তৈরি।

আমরা গুটি গুটি পায়ে দোতলায় যাবার রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে তীর চিহ্ন দিয়ে কফি হাউসে যাবার রাস্তার নির্দেশ দেওয়া আছে। আমরা ভাবি নি কফি হাউসে বসার জায়গা পাব। আমরা ভিতরে ঢোকা মাত্র একজন স্থানীয় তরুণী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কোথায় বসতে চাই। বললাম ব্যালকনিতে। আমাদের নিয়ে গিয়ে পছন্দসই জায়গাতে বসার ব্যবস্থা করে দিল। বিদেশে এসে একদিন হোটেলবন্দি ছিলাম, আজকে মুক্তির আনন্দ।

ব্যালকনিতে বসে বসেই দেখছিলাম অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, লেকের বুকে ছোট ছোট ঢেউ। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভিয়েতনামি মহিলা পুরুষ স্কুটার চালিয়ে গন্তব্য অভিমুখে চলে যাচ্ছে। অনেকে মাথায় বিশাল ছাতা ধরে জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। দোতলার ব্যালকনিতে বসে হ্যানয় এর চলমান জীবন প্রত্যক্ষ করছিলাম। কফি হাউসে সাদা চামড়ার নারী পুরুষের ভীড়। বিয়ার গ্লাস হাতে গল্প গুজবে মত্ত। আমাদের পাশের টেবিলে কয়েকজন তরুণ ভারতীয় বসে গল্প করছে। তার মধ্যে একজন উঠে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে গেল।

আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে বসে বসে রাস্তার শোভা দেখছি। হ্যানয় এ কোনদিন আসব ভাবিনি। যদিও ছাত্র জীবন থেকেই ভিয়েতনাম এবং হোচি মিন আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে। হো চি মিনের জন্মস্থান এখান থেকে গাড়িতে চার পাঁচ ঘন্টার পথ। kim lien গ্রামে হো চি মিনের জন্ম। বাবা ছিলেন কনফুসিও পন্ডিত।

হো চি মিনের জীবন বৃত্তান্ত বেশ রোমাঞ্চকর। ১৮৯০ সালে তার জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। যদিও তার জন্ম সাল নিয়ে বিতর্ক আছে। ভিয়েতনামে তখন ফরাসিরা শাসন করছে। ফরাসি শাসনের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই হোচিমিন বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৯১১ সালে তিনি জাহাজে কাজ নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। জাহাজ আফ্রিকার বন্দর ছুঁয়ে মার্কিন দেশে এসে পৌঁছয়। নিউইয়র্কে কিছুদিন তিনি বাস করেন। সেখান থেকে আবার জাহাজে চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডনের জীবন যাপনের জন্য হোটেলে কাজ নেন। লন্ডনের জীবনযাত্রা তার ভাল লাগেনি। যদিও লন্ডনে থাকাকালীন আইরিশ বিপ্লবীদের সম্বন্ধে জানার তার সুযোগ হয়েছিল। লন্ডনে বাস করে ভিয়েতনাম বাসীর কোন উপকারে তিনি আসতে পারবেন না বলে তার মনে হয়। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ফ্রান্সে অনেকদিন অতিবাহিত করেন। ফ্রান্সেই তিনি প্রথম প্রবাসী ভিয়েতনামিদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। ফ্রান্সে

বসবাসকালীন তার বিপ্লবী সত্তা বিকশিত হয়। ফ্রান্সে থাকা কালীন তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লেখান। বস্তুতপক্ষে তিনি ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন।

ফ্রান্স থেকে তিনি রাশিয়া তে যান লেনিনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি যখন রাশিয়াতে পৌঁছন তখন লেনিন গত হয়েছেন। স্টালিনের সঙ্গে তার দেখা হয়। রাশিয়াতে তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ডিবেটে অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়া থেকে তিনি চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ ঘুরে দীর্ঘ ৩০ বছর পর ভিয়েতনামে ফিরে আসেন। বিদেশে এই ৩০ বছরের বেশিরভাগ সময়টাই তার কাটে ঔপনিবেশিক দের হাত থেকে ভিয়েতনামের মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠন তৈরি করতে, বক্তৃতা এবং লেখালেখির মাধ্যমে ভিয়েতনামের মানুষের দুর্দশার কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে, রাশিয়াতে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভিয়েতনামের মুক্তির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পথ সুগম করতে।

ভিয়েতমিন সংগঠিত আগস্ট বিপ্লবের পর ১৯৪৫ সালে , হো চি মিন ভিয়েতনামের অস্থায়ী সরকারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান হবার পর তিনি তার প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন ভিয়েতনামের শিশুদের উদ্দেশ্যে। স্বাধীন ভিয়েতনাম গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তাবে যাদের উপর।

আমাদের খাবার এসে গিয়েছিল। গ্রিলড স্নেক হেড মাছের একখানা পদ এবং আলু ভাজা। তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে চলেছে। যারা খাবার সার্ভ করছিল তারাই একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল।

৯ সেপ্টেম্বর

গতকাল রাতে খাওয়া-দাওয়া করে ঘরে এসে দেখি হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ এসেছে। আমাদের ভিয়েতনামের ট্রাভেল এজেন্টের মেসেজ। তাড়াতাড়ি মেসেজটা খুললাম। সেখানে লেখা রয়েছে আগামীকাল আমাদের সকাল সাড়ে সাতটার সময় Ninh Binh নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের এই প্রোগ্রামটা ছিল ৭ সেপ্টেম্বর। কিন্তু টাইফুনের জন্য এই কর্মসূচিটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। মেসেজটা পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে গেল। নিন বিন তাহলে যাওয়া হচ্ছে।

ভোর বেলায় উঠে তড়িঘড়ি করে তৈরি হয়ে নিলাম। মালপত্র হোটেলের রিসেপশনে জমা রেখে ব্রেকফাস্ট রুমে গেলাম। কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্টে খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। কিন্তু পেট পুরে খাওয়ার সময় কোথায়। আমরা সামান্য কিছু খেয়ে হোটেলের লবিতে চলে এলাম। আমাদের দিকে একটি তরুণ হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। আমাদের আজকের ট্যুর গাইড হ্যারি। ছিপ ছিপে লম্বা সুন্দর চেহারা ,মুখে সবসময় হাসি লেগে রয়েছে। হোটেলের সামনেই একটি বিশাল গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের জন্যে।

গাড়ি যখন চলতে শুরু করল তখন ৭টা বেজে ৩৫ মিনিট। আজকে আমাদের আবার দানাং যাবার কথা। সন্ধে ছটার সময় ফ্লাইট । বিকেল চারটের মধ্যে আমাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে হবে। কাজেই হাতে সময় কম। তার মধ্যে আমাদের নিম বিন গমন সম্পূর্ণ হবে কিনা সে ব্যাপারে একটু চিন্তা ছিল।

হ্যারী আমাদের সঙ্গে রাস্তায় গল্প করতে করতে চলল। ও মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে। ভিয়েতনামের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে ভাষার। এখানে ইংরেজি ভাষা কেউ বোঝে না বললেই চলে।।

এখন পর্যটনের কল্যাণে অনেক তরুণ ছেলে মেয়ে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে শুরু করেছে। হোটেলের রিসেপশনে মেয়েদেরই বেশি চোখে পড়ল। তারা কাজ চলার মত ইংরেজি বলতে পারে।

হ্যাঁনয় শহরের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। হোচিমিনের সমাধিক্ষেত্র, ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, লেক ছাড়িয়ে, আমরা এগিয়ে চললাম। হ্যানয় শহরটি বিশাল বড়। রাস্তাগুলো চওড়। দুধার দিয়ে স্কুটারের স্রোত। রাস্তার পাশে একটা স্কুল চোখে পড়লো। গেটের সামনে ছেলে-মেয়েদের ভিড়। সেই সঙ্গে স্কুটারের। বাবা মা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে ছেড়ে দিতে এসেছে।

আমাদের গাড়ি বেগে ছুটছিল। রাস্তা বেশ মসৃণ। যতো এগোচ্ছি বাড়িঘর আস্তে আস্তে কমে আসছে ।শহরতলী পেরিয়ে এসেছি। দুপাশে এখন সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে জনপদ চোখে পড়ছে। সার বেঁধে একতলা বাড়ি, ঢালু ছাদ। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, তাছাড়া বছরে কয়েকবার টাইফুনের উপদ্রব।। রাস্তার দুপাশে অনেক জায়গাতেই দেখছি ল্যাম্পপোস্ট ভেঙে পড়ে রয়েছে।

ঘন্টা খানেক চলার পর চা'পানের বিরতি। হ্যারি বলল এখানে তোমরা খাবার খেয়ে নিতে পারো। আমাদের কালকেই বলা হয়েছিল যে মাঝে একটা বিরতি দেওয়া হবে সেখানে ব্রেকফাস্ট এর ব্যবস্থা আছে। ভিতরে ঢুকে দেখি বিশাল ব্যবস্থা। আমাদের দেশের শপিং মলের মতো। স্থানীয় হাতের কাজের বিশাল সম্ভার। ভারী সুন্দরভাবে সাজান। সাহেব মেমরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, টুকিটাকি কেনাকাটি করছে।

বিশাল হলের একপাশের টয়লেটের সুন্দর ব্যবস্থা। অন্য পাশে খাবারের আয়োজন। এখানে আমাদের কিনে খেতে হবে। আমরা চারিপাশ ঘুরে দেখে খাবার টেবিলে এসে বসলাম। নানা ধরনের খাবার পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ভিয়েতনামি বান বাও, (Banh bao) খেলাম। এটা ময়দা দিয়ে তৈরি । হ্যারি আমাদের জন্য কফি নিয়ে এলো। ভিয়েতনামের কফি খুব জনপ্রিয়।

জায়গাটির রক্ষণাবেক্ষণ চমৎকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিশেষ আওয়াজ নেই, সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। ভিয়েতনামের পর্যটনের উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে এরা পর্যটনের মাধ্যমে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে পর্যটকরা আসছে এখানে। এশিয়ার পর্যটকরা তো আছেই।

নিন বিন প্রদেশটি হ্যানয় থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশের অন্তর্গত হোয়া লুতে, দশম শতাব্দীতে ভিয়েতনামের রাজধানী ছিল। তখন জায়গাটির পরিচিতি ছিল প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে। নিম বিন প্রদেশ ভিয়েতনামের উত্তর অঞ্চলের রেড রিভার ডেল্টা অঞ্চলে অবস্থিত।

ভিয়েতনামের প্রাচীন রাজধানীর রাজ প্রাসাদ এখন ভগ্ন স্তূপ।আরো কিছু পথ এগিয়ে আমরা ট্র্যান আন নদীর ধারে এসে পৌছালাম। দূর থেকেই সবুজ নদীর জল দেখা যাচ্ছিল। চারিপাশে চুনাপাথরের পাহাড় তারই মাঝে দিয়ে ট্র্যান আন নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনানীর আচ্ছাদন। জায়গাটি ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইটের তকমা পেয়েছে।

আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে হ্যারি টিকিট কেটে আনল। হ্যারির পিছন পিছন আমরা একটি সেতু পেরিয়ে নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম অসংখ্য নৌকা নদীর জলে ভাসছে। নদীর মুখে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, কারণ এক একটি নৌকোতে চারজন করে যাত্রী চাপতে পারে। প্রত্যেকটি নৌকার মাঝি ভিয়েতনামি টোকা পরিহিত মহিলারা। তারাই হাল ধরে বসে আছে আরোহীদের অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পরেই আমাদের ডাক পড়ল। নৌকা এসে লেগেছে সিঁড়ির ধাপে। প্রথমে দুজন ভিয়েতনামি দম্পতি উঠলেন। তারপর সুতপা এবং সর্বশেষ আমি। আমাদের দু'ঘণ্টা নৌকা সফর। স্থানীয় বাঁশের তৈরি নৌকা। নৌকা গুলোকে সামপান বলা চলে। চারজন করে নৌকোতে বসার জায়গা। একদম পিছনে হাল ধরে মাঝি বসে। ট্র্যান আন নদীর বুকে আমরা ভাসতে শুরু করেছি। দুপাশের সুউচ্চ চুনাপাথরের পাহাড়।

পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল। পান্না সবুজ জল। নদীর বুকে অসংখ্য সাম্পান ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের একটা করে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামনে যে ভিয়েতনামি দম্পতি বসে ছিলেন তাদের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোকের বয়স বছর ৭০-৭২। পেটানো চেহারা। ভদ্রমহিলা ধবধবে ফর্সা, মাথায় একটি টুপি পড়ে রয়েছেন। ওদের বাড়ি হ্যানয়ে। ওরা এক সঙ্গে ছয় জন এসেছেন। চারজন অন্য একটি সাম্পানে আর আমাদের সঙ্গে বাকি দুজন।

এই শান্ত সমাহিত পরিবেশে পান্না সবুজ জলের উপর নৌকা ভ্রমণ, মনের গভীরে প্রশান্তির প্রলেপ একে দেয়। চতুর্পাশে অপার শান্তি বিরাজ করছে। আমরা কখনো পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছি কখনো আবার দু'পাশের পাহাড় আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমরা তখন মাঝ দরিয়ায়। নদীর জলে পাখি ভেসে চলেছে। কখনো স্নান করে পাখা ঝাপটাচ্ছে, কখনো বা জোড়ায় জোড়ায় সাঁতার কেটে নৌকার পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সামনের ভিয়েতনামের ভদ্রমহিলা হঠাৎ একটা হাল তুলে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে হাল দিয়ে জল কাটাতে শুরু করলেন। ওনাকে দেখে আমারও একটু ইচ্ছে জাগল হাল ধরতে। পায়ের কাছেই একটা হাল ছিল তুলে নিলাম। আমাদের মাঝি আমাকে দেখিয়ে দিল কিভাবে হাল ধরে জল কাটাতে হয়। মিনিট ১০-১৫ হাল ধরে, বুঝলাম অসম্ভব শারীরিক শক্তির প্রয়োজন বৈঠা চালাতে। ভিয়েতনামি মহিলা মাঝিটি দু'হাতে বৈঠা চালিয়ে এভাবে নদীর বক্ষে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। কি অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা এখানকার স্থানীয় মহিলাদের। এদের পরাক্রমের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল ফরাসিরা মার্কিনীরা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। মনে মনে এদের স্যালুট করলাম।

এভাবেই যেতে যেতে আমরা একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম। মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছে । গুহার গায়ে আলো জ্বলছে। যেখানে আলো নেই সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। আমরা এভাবে প্রায় এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গুহার বাইরে আলোর জগতে প্রবেশ করলাম।। নদীতে আরো কিছু পথ অতিক্রম করে আমরা একটি মন্দিরের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। বহু প্রাচীন বুদ্ধ মন্দির। নৌকা থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে মন্দিরের চাতালে এসে দাঁড়ালাম। মন্দিরের ভিতরে মৈত্রেয় বুদ্ধ মূর্তি । ছবি তোলার নিষেধাজ্ঞা নেই। ছবি তোলা শেষ হলে নদী বক্ষে ফিরে এলাম। আমাদের সাম্পান ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। নৌকার মাঝির ভাষা বুঝিনা। শুধু মৃদু হাসির বিনিময়। নদীর বুকে মাঝে মাঝে প্যাগোডার আদলে বিশ্রামের জায়গা। তীর ঘেঁষে যখন যাচ্ছি, তখন স্থানীয় আদিবাসীদের বাসস্থান চোখে পড়ল।। নিচটা গোলাকৃতি মাথার দিকটা ছুঁচোলো। ভিয়েতনামি দম্পতি জানালো ওখানে স্থানীয় আদিবাসীরা বাস করে। নদীর কিনারায় পদ্ম বন । নিটল গোল গোল পাতা, জলের উপর ভেসে আছে। ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। ট্র্যান আন নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে আমরা ঘাটে ফিরে এলাম।

আজকে আমরা ডানাং যাব। আমাদের ফ্লাইট সন্ধ্যে ছটায়। নিন বিন থেকে আমরা যখন হ্যানয় এসে পৌঁছেছি তখন প্রায় বেলা দুটো। হোটেল থেকে আমাদের মালপত্র সংগ্রহ করে, আমাদের গাইড হ্যারি নির্দেশ মত আমরা একটি ভিয়েতনামি রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম। হ্যারির প্রবল ইচ্ছে আমরা স্থানীয়

ভিয়েতনামি খাবার খাই। ছোট লম্বাটে রেস্তোরাঁ। দেওয়ালে ভিয়েতনামের নিসর্গ দৃশ্য আঁকা। আমাদের পাশের টেবিলে অনেক সাহেব বসে খাচ্ছে। বেশ ছিমছাম,ঘরোয়া পরিবেশ। আমরা shrimp ফ্রাইড রাইস অর্ডার দিলাম। এক প্লেটে আমাদের দুজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাবার। আমরা দুজনে ভাগ করেও শেষ করতে পারলাম না। রান্না ভালই, তবে এরা ফ্রাইড রাইসে একটু ঝাল দেয়। দাম আমাদের পকেটের সঙ্গে সমঞ্জস্যপূর্ণ। এক প্লেটের দাম আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় ৩৫০ টাকা। খাওয়া দাওয়ার পর বিল মিটিয়ে দেখি এক মুখ হাসি নিয়ে হ্যারি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে খাবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, ও রাজি হয়নি। ওকে খুব ভালো খেলাম জানাতে ভীষণ খুশি। আমাদের গাড়ি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে। ও আমাদের রাস্তা পার করে দিল।

দানাং এসে যখন নামলাম তখন সন্ধ্যে ছটা বাজে। এক ঘন্টার ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য প্ল্যাকার্ড হাতে গাড়ি চালক দাঁড়িয়েছিল। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল খুব বেশি দূরে নয়। বিশাল এক হোটেলের সামনে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আমাদের নামিয়ে দিয়ে চালক জানালো, কাল সকাল আটটায় স্থানীয় গাইড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

রিসেপশনে যাবতীয় কাজ সেরে আমরা লিফটে চড়লাম। সাত তলার ৭০২ নম্বর ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা।

১০ সেপ্টেম্বর

সকালে ঘুম থেকে উঠে, পর্দা সরিয়েই দেখি দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। পূর্ব ভিয়েতনাম উপসাগর ,(দক্ষিণ চীন উপসাগর)। সাগর সৈকতে নারকেল গাছের সারি, কিছুটা দূরে চুনাপাথরের পাহাড় সাগরের বুকে নেমে এসেছে। সাগরের বালুময় তটভূমিতে, মানুষজন চলাফেরা করছে। অনেকে সাগরের জলে স্নানে ব্যস্ত।

আমাদের বেলা নটার মধ্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে। আমাদের স্থানীয় গাইড হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিল। ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমরা বেশ পরিশ্রান্ত, বেলা নটার আগে তৈরি হতে পারব না।

দোতলায় নেবে, ব্রেকফাস্ট এর লবিতে কাঁচের জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। হোটেল পেরিয়েই গাড়ি চলাচলের বড় রাস্তা। রাস্তার দুপাশ দিয়ে গাড়ি ছুটছে। রাস্তার ওপাশেই সমুদ্র সৈকত, ভোরের আলোয় চিক চিক করছে। দিগন্তে ,আকাশ এসে সাগরে মিশেছে। জানলার পাশে বসে এই অপূর্ব শোভা অবলোকন করতে করতে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। দানাং ভিয়েতনামের চতুর্থ বৃহৎ শহর। এখানে পোতাশ্রয় আছে। সমুদ্র কিনারায় অবস্থিত হওয়ার কারণে বিদেশিদের বাণিজ্য তরী এখানে এসে ভিড়তো । বিদেশি বণিক এবং ধর্ম প্রচারকেরা এই দানাং দিয়েই ভিয়েতনামে প্রবেশ করে । ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক পর্তুগিজ অভিযাত্রী সর্বপ্রথম দানাং বন্দরে এসে পৌঁছায় বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ফরাসিরা এই দানাং এর ভিতর দিয়েই ভিয়েতনামে প্রবেশ করে এবং উপনিবেশ গড়ে তোলে।

প্রাতরাশ সেরে নিচের রিসেপশনে গিয়ে দেখি আমাদের গাইড অপেক্ষা করছে। আজ আমাদের গন্তব্য বানা হিলস। দানাং থেকে প্রায় দু'ঘণ্টার পথ। গাড়িতে যেতে যেতে গাইড আমাদের বানা হিলসের গল্প শোনাচ্ছিল। এক সময় বানা হিলসে ফরাসি কলোনি ছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট বা তারও বেশি উঁচুতে বানার অবস্থান। ফরাসিরা এই জায়গাটাতে অনেক কটেজ তৈরি করে বসবাস করত। উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত হওয়ার দরুন তাপমাত্রা সমতলের থেকে কম ছিল। এই জায়গাটিতে ফরাসিরা ক্ষত্রন্দ্রত্রণ তৈরি করেছিল। সেখানে বিয়ার থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফরাসি মদ তৈরি হতো।

পাহাড়ের মধ্যে সুরঙ্গ করে সেখানে ফরাসি মদ তৈরীর ব্যবস্থা করেছিল। জীবন যাত্রা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। ফরাসি সেনাবাহিনীর লোকেরা এখানে ছুটি কাটাতে আসতো। অভিজাত এই শৈল শহরে ধনী ভিয়েতনামিরা ছাড়া , স্থানীয়দের আসার সামর্থ্য ছিল না। ১৮৪৫-৫০ কাল নাগাদ জায়গাটি ভিয়েতনামের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। ফরাসি কলোনি টি ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ভিয়েতনামের একটি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ জায়গাটি পর্যটনের উপযুক্ত করে তোলে।

দানাং ছেড়ে কিছুটা এগোবার পরেই রাস্তার দু'পাশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে লাগলো। রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ জঙ্গল, দূরে সুউচ্চ পর্বত। পর্বত গাত্র ঘন সবুজে মোড়া। চতুর্পার্শ্বের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম। ঘন্টা দেড়েক চলার পর আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিনদেশী পর্যটকেরাও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রত্যেকেই মোবাইল হাতে ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমরা অনেক ছবি তুললাম। চিৎকার চেঁচামেচি হইহুল্লোড় নেই শান্ত সমাহিত পরিবেশ।

একটু পরেই গাইড আমাদের টিকিট কেটে নিয়ে এলো। দুপাশে ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে বাঁধানো পথ। তার মধ্যে দিয়ে আমরা পর্যটকেরা এগিয়ে চলেছি। কোথাও কোন অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নেই। অবাক হয়ে দেখছিলাম ভিয়েতনামের পর্যটন কত উন্নত এবং রুচি সম্মত। বানা হিলসে যাবার জন্য আমাদের চার হাজার ফিট উঁচুতে উঠতে হবে। গাইড জানালো সামনেই এস্কেলেটর রয়েছে। অনেক পথ হাঁটতে হচ্ছে।

মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা। ক্রমে আমরা এস্কালেটারের সামনে এসে পৌঁছলাম । এস্কালেটারে কিছুটা উচ্চতা অতিক্রম করে দেখি, সামনে আবার এস্কালেটার। কিছুটা পথ আমরা হাঁটছি আবার এস্কালেটারে চাপছি। এইভাবে নটা এসক্যালেটরে চাপার

পর আমরা একটি বৃহৎ গোলাকৃতি ঘরে এসে উপস্থিত হলাম।। সেখানে বসার জায়গা আছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস সহ আরো কিছু টুকিটাকি খাবার ব্যবস্থা আছে এবং সেইসঙ্গে রেস্টরুম বা টয়লেটের ব্যবস্থা। কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অনেকেই এখানে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘরটির এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিডি ভেঙ্গে আমরা Cable Car স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। চলমান কেবল্ কার। থামছে না। গতি কমে এলে চড়ে পড়তে হবে। চতুরপাশ ঢাকা একটি কাঁচের বাক্স। সেখানে ৮ জন বসতে পারে। আমরা ছাড়াও আরো দুজন সেখানে এসে বসেছে। চারিপাশের দৃশ্য মনমুগ্ধকর। পাহাড় পেয়ে আমরা ক্রমশ উপরে উঠে চলেছি। নিচে গভীর খাদ। পাহাড়ের গায়ে একটি ঝর্ণা চোখে পড়ল। আমাদের বিপরীত দিকে যে দুজন বসেছিল, তাদের সঙ্গে মৃদু বাক্য বিনিময় হলো। একজন বয়স্ক ইউরোপিয়ান, সঙ্গে একজন এশিয় যুবতী। আমরা চারিপাশ অবলোকন করছি আর ছবি তুলছি। ইউরোপিয়ান টি মাঝে মাঝেই চারিপাশের দৃশ্য দেখে amazing-amazing বলে, পরক্ষণেই মহিলাটিকে চুম্বন করছে । Cable Car এর যাত্রা পথে বাইরের এবং ভিতরের দৃশ্য মনটাকে আনন্দে ভরপুর করে তুললো।

গাইড জানালো আমরা এবার ফ্রেঞ্চ ভিলেজ যাব। মনে মনে ভাবলাম ফ্রেঞ্চ ভিলেজ সে আবার কি। আরো কিছু পথ এগিয়ে দেখি ফরাসি স্থাপত্যের অনুকরণে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। ঘন্টা ঘর এবং গির্জাও আছে।

জায়গাটি একটি পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র। পর্যটন কেন্দ্রের একপাশে একটি স্কুত্রন্দ্রখন ছদ্রব্জস্ত্র। চতুর্পাশে অনেক খাবারের দোকান। সেখানে কন্টিনেন্টাল ফুড পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া ভিয়েতনামি নুডুলস, স্যুপ, পোর্ক, বিফ এবং সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন পদ। গাইড জানালো, বিশাল অট্টালিকা গুলি পর্যটন আবাস। ইউরোপিয়োরা এসে এখানে বাস করে। আমরা যখন কেবল কার থেকে নামলাম, তখন দেখছিলাম সাহেবদের সঙ্গে বড় বড় সুটকেস। কিঞ্চিত অবাকই হয়েছিলাম এখন কারণটা বুঝতে পারছি। বিনোদনের নানা রকম আকর্ষণও রয়েছে এখানে। গাইড বললো, চলো তোমাদের আরেকবার কেবল কারে চড়তে হবে’। কি ব্যাপার! কেবল কারে চেপে আমরা গোল্ডেন ব্রিজে যাব।

কেবল কার থেকে নেমে, কিছুটা হেঁটে আমরা গোল্ডেন ব্রিজে পৌঁছে গেলাম। ব্রিজের ওপরে তখন পর্যটকদের বিশাল ভিড়। প্রত্যেকেই ছবি তুলতে, সেলফি তুলতে ব্যস্ত। অর্ধগোলাকৃতি ব্রিজটি দুটো শ্যাওলা পড়া হাতের উপর রক্ষিত আছে। নিচে বিশাল উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। ব্রিজ থেকে সোজা তাকালে দুধ সাদা একটি বুদ্ধ মূর্তি চোখে পড়ে। নবনির্মিত ফরাসি ভিলেজটিও এখান থেকে দৃশ্যমান। গোল্ডেন ব্রিজ ভিয়েতনামের মানুষের একটি গর্ব। সত্যি মহাশূন্যে অবস্থিত সেতুটি প্রযুক্তির বিস্ময়কর সৃষ্টি। ফেরার পথে আমরা Brew House এ খাবার খেলাম। বানাহিলসে পৌঁছবার পরেই একটি মেয়ে আমাদের দুটো কুপন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিসের কুপন আমি বুঝতে পারিনি। বিয়ার হাউসের সামনে আসতেই সুতপা বলল তোমার পকেটে তো দুটো বিয়ারের কুপন আছে। কুপনটা বার করে দেখলাম ব্রু হাউসে বিনামূল্যে দুগ্লাস বিয়ার পাওয়া যাবে।

ব্রু হাউস এর ভেতরে বিশাল হল ঘর। সেখানে অন্তত শ’খানেক পর্যটক বসে খাবার আর বিয়ার খাচ্ছে। ভিতরে একটা কাউন্টার থেকে বিয়ার দেওয়া হচ্ছে। কাউন্টারের মুখে পৌঁছিয়ে কুপন দুটো দেখাতেই দু গ্লাস বিয়ার দিল। কাউন্টারের মাথায় লেখা বিয়ার স্টেশন।

বিয়ার স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি, মুক্তাঙ্গনে গিটার বাজিয়ে গান হচ্ছে। কয়েকজন সাহেব মেম গিটার বাজাচ্ছে ,একজন গান গাইছে আর দর্শকবৃন্দ সামনের চেয়ারে বসে মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দিচ্ছে। সত্যিই প্রমোদ ভ্রমণের আদর্শ জায়গা।

১১ সেপ্টেম্বর

আজ বেলা একটা নাগাদ হো চি মিন সিটিতে (সাইগন) এসে পৌঁছেছি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এক ঘণ্টার রাস্তা অতিক্রম করে আমরা বে হোটেল সাইগন এসে পৌঁছলাম। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। আসার পথেই আমাদের ট্যুর গাইড বলে দিয়েছিলেন, আমাদের আজ রাজপ্রাসাদ এবং ওয়ার রেমন্যান্ট মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হবে। রিসেপশনের কাজ সেরে আমরা সোজা ন তলায় এসে পৌঁছলাম। তৈরি হয়ে নিচে আসার পর, গাইড আমাদের জিজ্ঞেস করল, ভারতীয় রেস্তোরাঁতে যেতে চাই কিনা। আমাদের কোন আপত্তি নেই জানাতে, আমাদের একটি দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁতে নিয়ে যাওয়া হল। ছোট রেস্তোরাঁ অনেক ভারতীয়কে দেখলাম খাওয়া-দাওয়া করছেন। যারা খাবার পরিবেশন করছেন তারা স্থানীয় মানুষ।

ইংরেজি বোঝে না বললেই চলে। একজন ভারতীয় এসে আমাদের মেনু কার্ড দিয়ে গেল। আমরা ফ্রায়েড রাইস এবং আলুর দম অর্ডার দিলাম। রান্না বেশ ভালো, তবে ফ্রাইড রাইসটা বেশ ঝাল। পরিতৃপ্তি করে খেয়ে,গাড়িতে এসে উঠলাম। আমাদের এখন গন্তব্য স্থল War Remnants Museum। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে আমরা মিউজিয়ামের এর অঙ্গনে প্রবেশ করলাম। মিউজিয়ামের অঙ্গনটি বোমারু বিমান, প্যাটন ট্যাংক, হেলিকপ্টার, কয়েকটি অবিশ্ফোরিত অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত।

মিউজিয়ামের ভেতরে দুটো তলা জুড়ে অনেকগুলি কক্ষে প্রদর্শিত আলোক চিত্রগুলি, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের নৃশংসতার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রদশনীটি দেখতে দেখতে মন খারাপ হয়ে যায়। ভিয়েতনামি সৈন্যের ছিন্নমস্তক নিয়ে উল্লাসে

মত্ত মার্কিন সেনানিরা। ন্যাপাম বোমার আঘাতে গ্রামের পর গ্রাম ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। কোথাও আবার ওয়াটার টর্চারের আলোকচিত্র। একজন ভিয়েতনামের সৈনিকের মাথা কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কম্বলের উপর মার্কিনী সৈন্যরা হাসতে হাসতে জল ঢেলে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে অক্ষম ভিয়েতনামি সৈনিক টির যন্ত্রণা বিদ্ধ অন্তিম যাত্রার ছবি। দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধের সময় মাটির নিচে টানেলের জীবনযাত্রার ছবি ও বিবরণ এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে দিয়েন বিয়ের ফুর ফরাসি Prisoners of war দের আলোক চিত্র।

দিয়েন বিয়েন ফু গ্যারিসনের, ফরাসি সেনাপ্রধানের আত্মসমর্পণের চিত্র এবং চেয়ারম্যান হো চি মিন কর্তৃক দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ জয়ী সৈনিকদের সম্বর্ধিত করার আলোকচিত্র এখানে দেখতে পেলাম। এছাড়াও চোখে পড়ল একটি স্থাপত্য ভিয়েতনামি 'মা'। ভারী চমৎকার কাজ। শান্তিনিকেতনে সোমনাথ দার ভিয়েতনামি মা কাজটির কথাও মনে পড়ে গেল। ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামে, 'মায়েদের' অবদান অনস্বীকার্য।

প্রদর্শনী দেখে রাস্তায় নামলাম। মিউজিয়ামের ছবিগুলো দেখে মন বেশ ভারাক্রান্ত। কি পাশবিক অত্যাচার হয়েছে এখানকার মানুষদের উপর। তৎ সত্বেও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত, ফরাসি বা আমেরিকানরা দমন করতে পারেনি, এই ভিয়েতনামের মানুষদের। তীব্র জাতীয়তাবোধ, অদম্য জিদ, গেরিলা রণকৌশল, সর্বোপরি গভীর আত্ম সম্মানবোধ তাদেরকে এই যুদ্ধে জয়ী করেছিল।

রাস্তায় যেতে যেতে জানলা দিয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে আধুনিক ভিয়েতনাম চোখে পড়ল। চমৎকার রাস্তাঘাট। মাঝে মাঝে বৃক্ষ শোভিত পার্ক। ফরাসি স্থাপত্যশৈলীর কিছু দৃষ্টি নন্দন নিদর্শন। সাইগনের সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস ফরাসি আদলে নোটার দেম ক্যাথিড্রাল। এছাড়াও চীনা স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন প্রচুর রয়েছে শহরটিতে।

সুসজ্জিত আধুনিক পোশাক পরিহিত মানুষজন। রাস্তা দিয়ে বড় বড় গাড়ির মিছিল, আধুনিক রেস্তোরাঁ, বিশাল বিশাল বাজার বা মল। আধুনিক সাইগন্নে আভিজাত্য চোখ টানে। তুলনায় হ্যানয়, ভিয়েতনামের রাজধানী হলেও অনেক আটপৌরে।

আমাদের হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার নিচে নেমেছি। রিসেপশনে কিছু কাজ সেরে রাস্তায় বের হলাম। আমাদের হোটেলের পাশেই একটি রেস্তোরাঁ। ফুটপাতের উপর টেবিল চেয়ারপাতা। তরুন -তরুনীরা খাবার খেতে খেতে আড্ডা মারছে। আর কিছুদূর এগুলোই সাইগন নদী।

আমাদের হোটেলের ন'তলার ঘর থেকে ভোরেই চোখে পড়েছিল মাল বোঝাই ছোট ছোট স্টিমার নদীর বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক ইতিহাস আশ্রিত এই সাইগন নদী। আমরা কিছুদূর হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমাদের হোটেলের, ন' তলার ঘরের একটা অংশ মাটি থেকে ছাদ অবধি কাঁচে মোড়া। সেখানে বসে রাতের সাইগন কে দেখছিলাম। চতুর্দিকে আলোর মালা। রেস্তোরাঁ গুলিতে মানুষের ভিড়। সাইগন নদীর বুকে ভাসমান স্টিমারগুলি আলোর মালায় সজ্জিত। নদীর সেতুর উপর দিয়ে গাড়ির আলোর স্রোত বয়ে চলেছে।

আজ থেকে ৭০-৭৫ বছর আগে সাইগনের আকাশে তাকালে দেখা যেতো শুধু বোমারু বিমানের আনাগোনা। অজানা আশঙ্কার প্রহর গুণতো সাইগনের মানুষ। আর আজ সাইগন একটি আনন্দ নগরী। সারাদিন কাজ আর কাজ। কাজের শেষে শহর জুড়ে আনন্দের ফোয়ারা। তার মধ্যে বিষন্নতা যে নেই তা হয়তো নয়। কিন্তু স্বল্প কদিনের ভ্রমণে তা চোখে পড়ে না।

১২ সেপ্টেম্বর

আজ আমাদের গন্তব্য Cuchi tunnel. ভিয়েতনাম সিটি থেকে ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে এখানে পৌঁছতে। আমরা সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে বেলা সাড়ে এগারোটায় এসে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্য স্থলে। Cuchi এখন পর্যটকদের জন্য একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ১৯৬০-এর শেষ দিকে এখানে বিরাট সামরিক অভিযান হয়েছিল। এই অঞ্চলটিতে অনেকগুলি সুরঙ্গ আছে। বৃহত্তর টানেলের নেটওয়ার্কের একটি অংশ এটি। মাকড়সার জালের মতো অঞ্চলটিতে সুরঙ্গ ছড়িয়ে আছে। ভিয়েতনামি সৈন্যরা বা ভিয়েতকঙরা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই তিনটি স্তরে বিভাজিত সুরঙ্গ গুলি তৈরি করেছিল। সুরঙ্গের জীবন ছিল ভয়াবহ। বোমা বর্ষণের সময় সুরঙ্গের মধ্যে ভিয়েতকঙরা আশ্রয় নিত। ১০-১২ ঘণ্টার বেশি সুরঙ্গের মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। সুরঙ্গ গুলির মধ্যে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। সুরঙ্গ গুলিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় ছিল না। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হতো।

সুরঙ্গের মধ্যে সাপ বিছেসহ অন্যান্য বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব ছিল। মার্কিন সৈন্যরা সুরঙ্গগুলির সন্ধান পেলেও এর ভেতরে ঢোকার সাহস পায়নি। আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে সুরঙ্গ গুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি।

মাটির নিচে এরা হাসপাতাল তৈরি করেছিল। সেখানে অস্ত্রপচারের ব্যবস্থাও ছিল। সেসব জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়।। মাটি কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাটির নিচের হাসপাতালে এখনো অপারেশনের বেড এবং যন্ত্রপাতি রাখা রয়েছে। এছাড়া মাটির নিচে রান্না ঘরের ব্যবস্থা ছিল।

ধোওয়া নির্গমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল যাতে আকাশ থেকে চোখে না পড়ে। বড় বড় বৃক্ষ সন্নিবেশিত অঞ্চলটিতে ভিয়েতকঙরা বাঁশের সাহায্যে অনেকগুলি ফাঁদ নির্মাণ করেছিল। ভুল করে সেখানে পা দিলে মার্কিন সৈন্যদের বাঁচার কোন উপায়

থাকতো না। মাটির নিচে বড় একটি কনফারেন্স হল দেখানো হলো যেখানে যুদ্ধাভিযানের কলা কৌশল নিয়ে আলোচনা হতো। প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় নিয়ে আমরা সমগ্র জায়গাটি পরিদর্শন করলাম। মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়, ভিয়েতনামবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সেজন্য তারা যুদ্ধের ইতিহাসকে এত সুন্দরভাবে সুরক্ষিত করে রেখেছে। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় হো চি মিনের ধাতু নির্মিত একটি মূর্তি শোভা পাচ্ছে। হো চি মিনকে সেল্যুট জানিয়ে আমরা সাইগনের ফেরার পথ ধরলাম।

আগামীকাল আমরা ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে ভিয়েতনামে এসেছিলাম। এখানে এসে নতুন ভিয়েতনাম কে দেখলাম। একদলীয় সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভিয়েতনাম যথেষ্ট উন্নতি করেছে। মহিলাদের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মহিলাদের শিক্ষার হার আশি শতাংশেরও বেশি। অর্থনীতিতেও ক্রমশ বলিয়ান হয়ে উঠছে দেশটি । মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী ভারতের থেকে উঁচুতে অবস্থান করছে ভিয়েতনাম। প্রায় মধ্যরাত্রে যখন হোটেল ছেড়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি, তখনো প্রচুর গাড়ি চলাচল করছে রাস্তায়। আর কোনদিন হয়তো আসা হবে না। ভিয়েতনাম এক সময় আমাদের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে ছিল, স্বপ্ন দেখিয়েছিল, ভিয়েতনাম এসে সেই স্বপ্নের বাস্তব প্রকাশ দেখলাম। যুদ্ধ বিধ্বস্ত গরিব দেশটি, বিগত ৫০ বছরে কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে, স্বচক্ষে দেখে, গর্বে বুক ভরে গেল। বিদায় ভিয়েতনাম! *(শেষ)*

জি এন সাইবাবার মৃত্যু কি এক পরিকল্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা?

অমিতাভ সিনহা

''আমি মরতে একেবারেই নারাজ,
কিন্তু দুঃখের বিষয় হল ,
ওরা জানেনা আমায় কিভাবে মারবে ,
আমি যে খুব ভালবাসি ঘাসের মাথা তোলার শব্দ''

-এই কবিতাটি বিশিষ্ট শিক্ষক ও মানবাধিকার কর্মী জি এন সাইবাবার প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে প্রকাশিত বই 'হোয়াই ডু উই ফিয়ার মাই ওয়ে সো মাচ'এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দীর্ঘ দশ বছর কারাবাসের পর মাত্র সাত মাস আগে গত মার্চ মাসে তিনি মুক্তি পান। গত ১২ অক্টোবর তিনি ঘাসের মাথা তোলার শব্দ শুনতে শুনতে চিরবিদায় নিলেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রামলাল আনন্দ কলেজের ইংরাজীর কৃতি অধ্যাপক সাইবাবাকে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগ আছে এই অভিযোগে, ২০১৪ সালের ৯ নভেম্বর বেআইনী কার্যকলাপ রোধ আইনে (ইউএপিএ) মহারাষ্ট্র পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে তার বাসভবন তল্লাশি করা হয়। এরপর ৭ মার্চ ২০১৭ সালে গড়চিরৌলির বিশেষ আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেয়। এই রায় মুম্বাই হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চের বিচারপতিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সরকারী অনুমতি না নেওয়া সহ বিভিন্ন কারণে ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে নিম্ন আদালতের রায়। আদালত তার মুক্তির নির্দেশ দেয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে মহারাষ্ট্র সরকার সুপ্রীম কোর্টের ছুটির দিনে বিশেষ জরুরি বেঞ্চে মুক্তির বিরুদ্ধে আবেদন করে বলে যে এই অধ্যাপক শতকরা ৯০ ভাগ বিশেষভাবে সক্ষম ও হুইল চেয়ারে চলাফেরা করলেও তার মস্তিষ্ক খুবই সজাগ ও কার্যকরী, তাই একে মুক্তি দিলে তা দেশের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক হবে। মহামান্য বিচারপতি এম আর শাহ ও বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী হাই কোর্টের দেওয়া মুক্তির নির্দেশ খারিজ করে দেন। এরপর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের করা আবেদনের ফলে সুপ্রীম কোর্ট এই মামলাটি পুনরায় হাই কোর্টে ফেরত পাঠায়। গত ১৯ এপ্রিল ২০২৩ সালে হাইকোর্ট বিচারের ব্যর্থতার কারণে এই মামলায় সাইবাবাকে মুক্তির আদেশ দেন। বিচারপতিরা লক্ষ করেন যখন তার বাসভবন থেকে বিভিন্ন নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তখন সাইবাবা বা কোনও শিক্ষিত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না । একজন লেখাপড়া না জানা মানুষকে সাক্ষী করে পুলিশ পঞ্চনামা তৈরী করেছে। এর ওপর কোন অভিযুক্তকে সাজা দেওয়া যায় না, ফলে এই ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে তাঁর মুক্তির রায় দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ত বিজেপি সরকার সাইবাবাকে নাগপুর জেলের কুখ্যাত আন্ডা সেলে বন্দী করে রাখে। এই সেলে একজন মানুষ ঠিকমত থাকতে পারে না, সেখানে তার সঙ্গে আরো তিনজন বন্দীকে একই সেলে রাখা হয়েছিল। সাইবাবার দুবার করোনা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চিকিৎসা হয় নি, বারবার টালবাহানা করা হয় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা নিয়ে। অবশেষে ৭ মার্চ ২০২৪ সালে তিনি মুক্তি পান। ইতিমধ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করে। তিনি এর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। সামান্য গল স্টোন অস্ত্রোপ্রচার হওয়ার পর হঠাৎই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

৫৭ বছরের এই মানবাধিকার কর্মী দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পাশে সর্বদা দাঁড়িয়েছেন। জেলে থাকার সময় মায়ের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাকে জামিন বা প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় নি। অথচ ধর্ষণ মামলায় দোষী ধর্মগুরু রাম রহিম প্রতিটি নির্বাচনের আগে বিজেপির বদান্যতায় নিয়মিত প্যারোলে ছাড়া পেয়ে মাস খানেকের জন্য জেলের বাইরে হাওয়া খেতে গিয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য ছিল বিজেপি' র হয়ে ভোট প্রচার করা। এই হল বিজেপির আমলে বিচারব্যবস্থার হাল।

তাঁর মৃত্যুতে স্মরণসভা হয় সিপিআই এর উদ্যোগ হায়দ্রাবাদের ইন্দিরা পার্কে সেখানে বলা হয় সুপ্রীম কোর্টের

আদেশ এক অভূতপূর্ব ও অস্বাভাবিক আইনী পরিস্থিতি তৈরী করেছে যেখানে ঘোষিত নির্দোষ ব্যাক্তিকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল যা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ও নাগরিক স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংবিধানের ধারার পরিপন্থী। ন্যাশনাল কমিটি ফর রাইটস অব দ্য ডিসেবেলস আয়োজিত স্মরণসভায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী নন্দিতা নারাইন এই মৃত্যুকে প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা (ইনস্টিটিইশনাল মার্ডার) বলে অভিহিত করেছেন। কারাগারে এই শিক্ষককে চিকিৎসা দেওয়াতে অনীহা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই বিশেষভাবে সক্ষম মানুষটি যিনি শিশু অবস্থায় পোলিওর কারণে ৯০ শতাংশ অসক্ষম মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, সেই কারণগুলির ফলে এই উক্তি। চিকিৎসার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার জেলের মধ্যেই অনশন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন বিশেষভাবে সক্ষমদের সংগঠন সিসিপিডি বা কেউ তার পাশে এগিয়ে আসেন নি বলে অভিযোগ করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক বিকাশ গুপ্ত, সমাজসেবী হর্ষ মন্দার, সাংবাদিক জন দয়াল, শিক্ষাবিদ অনিতা দান্ডা। তারা আদিবাসীদের জমির ওপর কর্পোরেটদের যে কোপ পড়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও আন্দোলনে সাইবাবার ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

বাংলার ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি লাভ প্রসঙ্গে কিছু কথা

নীতিশ বিশ্বাস

কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং আই টি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গত ৩ অক্টোবর,২০২৪, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের পক্ষে জানান যে বাংলা, অসমিয়া, পালি, প্রাকৃত ও মারাঠিকে এবার ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। আমরা জানি এর আগে তামিল (১২/১০/২০০৪), সংস্কৃত (২৫/১২/২০০৫),তেলুগু(৩/১০/২০০৮), কান্নড় (৩১/১০/২০০৮), মালায়ালম (২৩/৫/২০১৩) ও ওড়িয়া (২০/২/ ২০১৪) কে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই স্বীকৃতি বাংলা ভাষার পক্ষে নিশ্চয়ই আনন্দের খবর। এই স্বীকৃতির পেছনে নানা কারণে বহু মানুষের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়েছিলো। আর এর জন্যে ভারতে মাতৃভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ, ঐকতান গবেষণা পত্র এবং তাদের বহু বন্ধু সংগঠন গুলি অনেকেই আন্দোলন করেছেন। এই জয় তাদের ও আমাদের সকলের জয়। আমাদের আন্দোলনের কথা বড় বড় মিডিয়া প্রচার করেনি;এমন কি আমাদের মতো এইসব অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের অন্যান্য সংবাদও খুব কমই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে বাংলা মিডিয়ায়। তবে আমরা একটানা ক্ষেত্র-সমীক্ষা, গবেষণা করা থেকে সংগঠন গড়ে তুলে তাদের পরে অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আন্দোলন করেছি , সে কথা সাধারণ ভাবে এ সব বিষয়ে যারা একটু সচেতন, তারা অনেকেই জানেন। আসলে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কখনই শিবসেনা মার্কা তথা, অসমিয়া, ওড়িয়া বা হিন্দুস্থানী (হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থান পন্থী) উগ্র-অন্ধ সংগঠন গুলির মতো অন্যভাষী বিতাড়নের উগ্র-ফ্যাসিস্ত পথে চলার ডাক দিইনি। (এ রাজ্যেও এমন কিছু সংগঠন আছে।) আমরা মুখ্যত সংবিধানের প্রতি আনুগত্য রেখেই দলিত- দরিদ্রের মহান ঐক্যে নিবেদিত হয়ে অরাজনৈতিক তথা অদলীয় গণ আন্দোলনের পথে চলেছি। তাই কখনওই আমরা চটকদার বনেদী মিডিয়ার আলোকে আলোকিত হতে পারিনি। পাই নি কোনো দলীয় শক্তির মদতও । এ সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়েই আমরা সাধ্যমত সঠিক ও সাংবিধানিক বৃত্তে থেকে মাতৃভাষা আন্দোলন করেছি। করছি। করেছি ধ্রুপদি ভাষার প্রয়োজনীয় স্বীকৃতির আন্দোলন। এখানে সে সব ঐতিহাসিক বিষয়ে সামান্য কয়েকটি কথা নিবেদন করি। তার আগে ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি বিষয়ে সরকার নির্ধারিত বিধিগুলিও সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

এ প্রসঙ্গে ২০০৬ সালে সংস্কৃতি মন্ত্রকের পক্ষে পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অম্বিকা সোনী জানিয়েছিলেন ঃ (১) এই ভাষাকে পুরনো নিদর্শনাদিসহ দেড় থেকে দুহাজার বছরের পুরনো হতে হবে। (২) থাকতে হবে প্রাচীন সাহিত্য সম্ভার। (৩) যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জাতি ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য করে আসছে আর সে সব সম্পদ অন্য ভাষাগোষ্ঠী থেকে ধার নেওয়া নয়। (৪)যার আধুনিকরূপ থেকে তার পুরনো-বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাবে আলাদা করা যাবে। (৫) তবে পুরনো কালের ভাষা আর আধুনিক কালের ব্যবহৃত ভাষাকে ধারাবাহিকতা হীন হতে হবে।

এইসব শর্ত মেনেই যে সব সময়ে সব কাজ হয়না তাও তারা স্বীকার করেছিলেন । তাই তারা বলেছিলেন- 'These are not classical language in the usual sence' অর্থাৎ প্রশ্নটা কত পুরনো তাতেও নয়, নয় অন্যান্য শর্তেও। অর্থাৎ এইসব সিদ্ধান্তের পেছনে যে রাজনীতি তথা ভোটের অংক আছে ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ কাজ করে তাতো সকলেরই জানা।

বাংলাভাষার এসব অনেক বৈশিষ্ঠ্যই আছে। বিশ্বখ্যাত বাংলা ভাষার ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার সেন, আচার্য মোহম্মদ শহিদুল্লাহর মতে চর্যাপদকে বাংলা ভাষার আদিরূপ ধরলে বাংলাভাষা হাজার ,বারশো বছরের পুরনো। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় থেকে থেকে আজকের আন্তর্জাতিক স্তরের ভাষা বিশেষজ্ঞ ও আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে বাংলা ৫/৬ শতকের ভাষা (সুতনুকা প্রত্নলিপি সহ নানা নিদর্শনের সূত্র তিনি উল্লেখ করেছেন) অর্থাৎ দেড় হাজার মাত্র নয় প্রায় ৭ হাজার বছর আগের ভাষা বাংলা। আর বাঙালির অস্তিত্বের কথা উঠলে তার প্রত্ন ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৭ম/৮ম শতকের বলে বহু তথ্য সূত্রেই

বাঙালির প্রত্ন তাত্ত্বিক নিদর্শনে মেলে।

ধ্রুপদি স্বীকৃতি পেলে তাদের কিছু অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও মিলবে (২) তবে আমরা জানি এই ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতির প্রশ্ন ও প্রসংগ রাজনৈতিক ভাবে আগে তেমন গুরুত্ব পূর্ণ ছিলোনা ,তা সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, ২০১৪ সালে প্রায় একই উৎস থেকে উৎসারিত ওড়িয়া ভাষা ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি (২০/২/২০১৪) পাওয়ারপর। আমরা ২০১৫-র ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গনের প্রেস কর্ণারে বিশিষ্ট ভাষা বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতে ভাষা গণতন্ত্র বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করি। যেখানে ভাষণ দেন মুখ্যবক্তা অধ্যাপক পবিত্র সরকার, রবীন্দ্র ভারতীর শেক্সপীয়ার অধ্যাপক অমিতাভ রায়, আসামের অধ্যাপক বিজিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জ্যোতির্ভূষণ দত্তসহ ওড়িশা, উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিসহ অনেকে এবং সূচক বক্তা ও সঞ্চালক ছিলেন নীতীশ বিশ্বাস। আমরা দাবি তুলি ওড়িয়া ধ্রুপদি ভাষা হলে একই উৎসের বাংলা কেনো সে স্বীকৃতিতে অভিসিক্ত হবেনা। আমরা তানিয়ে কেবল লেখালেখিই নয়, নানা পণ্ডিতদের কাছেও যাই। তার পর ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার করে এই দাবি ও অন্যান্য মোট ১৭দফা দাবি প্রস্তুত করি।

(৩) এই দাবিতে স্কুল-কলেজ বিশ্ববদ্যালয়, লোয়ার কোর্ট থেকে হাই কোর্টের প্রতিনিধি তথা বিচারপতিদের নিয়ে এই সেমিনারে আলোচনা করি ও তার দাবিতে পদযাত্রার আয়োজন করি। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিচারপতি শ্রী শ্যামল সেন ও সভাপতিত্ব করেন মঞ্চের সভাপতি ড. দিলীপকুমার সিনহা। এখানে দুইবাংলা, উত্তরপূর্ব ভারত ও কর্ণাটক - মহারাষ্ট্রসহ মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা যোগ দেন। আর এমন সব আয়োজনে ও পত্রিকা প্রকাশসহ ,ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে গবেষণা গ্রন্থাদির প্রকাশ ও প্রচারে বাংলাবিশ্বে ঐকতান ও ভাষা মঞ্চ আজও অনন্য। ২০১৩ সাল থেকেই আমাদের ১৭ দফা দাবিপত্র নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, রাজ্যপালগণ ও, রাষ্ট্রপতিকে যেমন, তেমনি পুরনিগম, পৌর সভা ও নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ডেপুটেশন, স্মারকলিপি প্রদান ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে মিছিল মিটিংকরে, অজস্র ক্ষুদ্রপত্রিকার লেখক সম্পাদক আর ভাষাপ্রেমী ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলি।

নয়া শিক্ষানীতি ও ধ্রুপদি ভাষাঃ আবার ধ্রুপদি ভাষার জন্য আন্দোলনে নতুন প্রবাহ আসে মোদী সরকারের নয়া শিক্ষানীতি চালু হলে।কারণ আপনারা জানেন ২০১৭ সালের জুন মাসে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটা জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করার জন্য কমিটি গঠন করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ড. কে. কস্তুরীরঙ্গন। আসলে যাদের মূল উদ্দেশ্য হল ঃ (১) শিক্ষাকে বেসরকারী করণ করা (২) শিশুদের এমন শিক্ষা পরিমন্ডলে সাইজ করা, যাতে তারা ইতিহাস ও দর্শনহীন এক রোবোটিক শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ার সস্তা মজুর তৈরির জন্য ছাত্রদেরকে প্রথমেই নিজের বাড়ির ভাষা (ধরা যাক বাংলা) বিদেশি ভাষা (ধরা যাক ইংরেজি) একটি অন্যভাষা (ধরাযাক হিন্দি) শিখতে হবে। এর দ্বারা তার আর পড়া না হলেও দেশীয় মাড়োয়ারি-প্রভুর দোকানে, এমন কি বড় হয়ে কর্পোরেট দোকানে মালবহনকারীও হতে পারবে। এই সব কারণে সে ঘরের ভাষা মাধ্যমে ঐ ৫ বছর শিখবে। পরে মাতৃভাষা (বাংলা) আর থাকবেনা; কারণ ৬ ষ্ঠ থেকে হিন্দি ইংরেজির সঙ্গে সে কেবল ধ্রুপদি ভাষাই সে পড়তে পারবে। এই শর্ত আরোপের পর আমরা এক দিকে এই কর্পোরেটবাদী নয়া-মনুবাদী শিক্ষানীতি বাতিলের আন্দোলনে নামি আর অন্য দিকে আন্দোলন করি কোনো ভাবে বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার তকমা পাওয়া যায়। পাঠক ভেবে দেখুন এ অন্ধ-গণতন্ত্রের চক্রব্যুহে এ ছাড়া বাংলাভাষীরা আর কি আন্দোলন করতে পারতো ? আপনাদের মনে আছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির উপরে উপরে বিরোধিতা করছিলো। এমনকি কেন্দ্রের কাছে বাংলার ভিন্ন মতামত পাঠানোর জন্য একটি ছয় সদস্যের কমিটিও করেছিল। যার সদস্য ছিলেন ঃ (১) পবিত্র সরকাব, (২) সৌগত রায়, (৩) সুরঞ্জন দাস, (৪) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, (৫) সব্যসাচী বসুরায় চৌধুরী, (৬) অভীক মজুমদার।

১৫ই আগষ্ট ২০২০ র মধ্যে তাঁরা সুপারিশ পত্র আহবান করেন। আমরা সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের পক্ষ থেকে তার আগেই প্রায় পাঁচ হাজার শব্দে আমাদের প্রতিবেদন পাঠাই। যেখানে ২নং ধারায় আমরা পরিষ্কার করে দাবি করি, 'ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; যেমন ওড়িশা সরকার তাদের ভাষার পক্ষে একটি যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্য নন্দিত প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল। যার ভিত্তিতে তারা এই স্বীকৃতি পায়।' তেমনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আপনারা এক্ষুণি করে অতিদ্রুত এই প্রস্তাব বাংলা আকাদেমি ও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠান, এই বাস্তব আবেদন জানাই। যার জন্য আমাদের মতো ক্ষুদ্র সংগঠন ২০১৪ থেকে লাগাতার আন্দোলন করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এই মহামূল্য-কমিটির প্রস্তুত করা সরকারী সুপারিশ পাঠানোর আগেই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি সর্বাংশে মেনে নেন আর তা প্রয়োগের জন্য সরকারী আদেশ নামা জারি করে দেন। রাজ্যবাসী মমতা ব্যানার্জির এই তঞ্চকতায় বিস্মিত হয়ে পড়েন। সে অন্য কথা। আমরা কিন্তু আরো দৃঢ়তার সঙ্গে ধ্রুপদি ভাষার জন্য আমাদের পক্ষে যা সম্ভব শুরু করি।

(১) প্রথমেই বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদদের দোরে দোরে যাই। কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশন করে প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং তারা যাতে পার্লামেন্টে বিষয়টি তোলেন তার জন্য প্রায় সব দলের সাংসদদের অনুরোধ পত্র পাঠালাম। এর ফলে মাননীয় সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও বিরোধী দল নেতা সম্মাননীয়

সাংসদ অধীরঞ্জন চৌধুরী বিষয় টি সংসদে তুললেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের বিবেচনার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তার অনেক পরে হলেও সরকারী তথ্যাদি নিয়ে রাজ্যসভায় বিষয়টি তোলেন সাংসদ ডঃ জহর সরকার (প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ)। অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি, প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রীকে ডেপুটেশন ও বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রীকে স্মারক লিপি প্রদান সহ আধিকারিকদের শাসক ও বিরোধী দলনেতাদের কাছে (নির্বাচনের আগে ও পরে) স্তরে স্তরে আমরা এইসব নিয়ে আবেদন ও দাবি পত্র জমা দিয়েছি। এছাড়া আগেই প্রায় দুই শতাধিক বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সহ ১৭-৫-২০১৭তারিখে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে নবান্নে গিযেও আমরা আমাদের দাবিপত্র জমা দিয়েছিলাম, যেখানে অন্য দাবির সংগে এই ধ্রুপদি ভাষার দাবিটিও ছিলো। কারণ ধ্রুপদি ভাষার দাবি তথা তার জন্য প্রকল্প পেশ করতে হলে নানা ধরনের তথ্যের সরকারী প্রত্যায়ন প্রয়োজন হয়। তার জন্য সরকারের মাধ্যমে ছাড়া তা জমা দিলে কার্যকরও হয় না। বার বার নানা স্তরে সে চেষ্টা চালোনোর পর এবং জনমত সৃষ্টি ও গবেষণার কাজ যুক্ত করতে হয়। সেই কাজটি বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সদ্য গড়ে ওঠা ইনিস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড রিসার্চ (ILSSR-Newtown) সম্পন্ন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন সভাপতি, অধ্যাপক ব্রাত্য বসু। ডাইরেক্টর, ড. স্বাতী গুহ। বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ হলেন ঃ (১) অধ্যাপক অমিতাভ দাস, বাংলা, (২) অধ্যাপক রাজীব চক্রবর্তী, ভাষাবিজ্ঞান, (৩) অধ্যাপক রজত সান্যাল, প্রত্নতত্ত্ব, (৪) ড. সোমনাথ চক্রবর্তী , সংস্কৃত, (৫) গবেষক সদস্য শ্রী সায়ক বসু।

তাদের গবেষণায় এটা প্রতিপাদিত হয়েছে যে চর্যাপদকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য দের রচিত চর্যাপদে যে বাংলা কাব্যভাষা প্রকাশিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তার আগে গদ্য বাংলার প্রচলন ছিলো। তার সন্ধানের জন্য নানা মুখী অনুসন্ধান তারা করেন। প্রখ্যাত গবেষক প্রবোধ বাগচির উল্লেখ সূত্রে তারা একটি চীনা-সংস্কৃত অভিধানের সন্ধান পান যার সংকলক মারা যান ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। ঐ অভিধানে অন্তত ৫০টা বাংলা শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ত বায়াংসিদশব্দ থেকে মঙ্গল কাব্যের সওদার কাহিনীর, বিনিময় বানিজ্য থেকে টলেমির ইতিহাসে মুদ্রা অর্থনীতির উল্লেখ এ কাজে অনেক সাহায্য তাদের করেছে। এছাড়া প্রত্নতত্ত্বের নানা নিদর্শন সন্ধান তারা করেন পাটুলি পুত্রের অশোকের শিলালিপিতে। পান মহাস্থান গড় ও চন্দ্র কেতুগড়ের নানা লিপিও । এমন কি তারা খনা- বরাহ মিহির কথার যুগ থেকে নানা পর্ব মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার শব্দের এই গবেষণা পত্র বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের অজস্র প্রমাণ দৃষ্টান্তের দ্বারা তারা উপস্থিত করেন। যা সমগ্র বাংলা ভাষার এক গৌরব জনক স্বীকৃতি। এজন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

(চলবে)

লেখক নীতিশ বিশ্বাস, সমাজ ভাষা গবেষক এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক, বাংলা ভাষা মঞ্চ ও ঐকতান গবেষণা পত্র।

স্মরণ :
রতন টাটা (১৯৩৭ -২০২৪)

প্রখ্যাত শিল্পপতি ও মানবহিতৈষী রতন টাটা গত ৯ অক্টোবর মুম্বাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬। তাঁর জন্ম ১৯৩৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুম্বাইতে। যদিও তাঁরা ছিলেন সুরাট থেকে আসা এক পার্শী ব্যবসায়ী পরিবার। বাবা ছিলেন নভোল টাটা। মা সুনি টাটা। বাবা নভোলকে পোষ্য পুত্র নিয়েছিলেন রতনজি টাটা। তিনি ছিলেন টাটা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জামশেদজি টাটার পুত্র।

রতন টাটার যখন ১০ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা ও মা সুনি টাটার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাঁকে পালন করেন তাঁর ঠাকুমা নভোজবাই টাটা, তিনি ছিলেন ঠাকুরদা রতনজি টাটার বিধবা পত্নী।

শিক্ষা ও কর্মজীবনঃ রতন টাটা ১৯৬১ সালে টাটা গ্রুপে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল টাটা স্টিলের শপ ফ্লোর পরিচালনা করা। এরপর পড়াশোনা শেষ করতে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে যান তিনি। এছাড়া তিনি কর্নেল ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ আর্কিটেকচারও পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৯১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত টাটা গ্রুপ ও টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এবং অক্টোবর ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন টাটা ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান। ২০০৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন টি. সি. এস.। তার নেতৃত্বে টাটা গ্রুপ ইস্পাত প্রস্তুতকারক কোরাস, ব্রিটিশ মোটর গাড়ি সংস্থা জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার এবং ব্রিটিশ চা সংস্থা টেটলির সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ফলে টাটা কোম্পানি বিশ্বের দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। ২০০৯ সালে ছোট গাড়ি ন্যানো তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তিনি। যাতে সাধারণ মানুষ মাত্র এক লক্ষ টাকা খরচ করে এই গাড়ি কিনতে পারেন সেটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুরে গাড়ি তৈরির কারখানার কাজ অনেকটাই এগিয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে তিনি গুজরাটের আনন্দে এই গাড়ি তৈরি করার কারখানা স্থাপন করেন।

রতন টাটা নিজেকে বিভিন্ন সেবামূলক কাজেও নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে টাটা গ্রুপ ভারতের স্নাতক শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৮ মিলিয়ন ডলারের টাটা স্কলারশিপ ফান্ডের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১০ সালে একটি এক্সিকিউটিভ সেন্টার নির্মাণের জন্য হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল তাঁরই উদ্যোগে ৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখান থেকেই তিনি স্নাতক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। ২০১৪ সালে টাটা গ্রুপ মূলত গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়ার জন্য আইআইটি বোম্বেকে ৯৫ কোটি টাকা অনুদান দেয়। সাধারণ মানুষের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু মানবপ্রেমিক নন পশুপ্রেমিকও ছিলেন তিনি। রাস্তার কুকুরদের উপযুক্ত খাদ্য, প্রয়োজন হলে

ঠিকমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন তিনি।

মৃত্যু ঃ ৬ অক্টোবর ২০২৪-এ রতন টাটাকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন ৭ অক্টোবর তাঁর এনজিওগ্রাফি করা হয়েছিল। তাঁর হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হয়। ২০২৪ সালের ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র সরকার এক দিনের শোক ঘোষণা করে।

ভারত সরকার রতন টাটাকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চরাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মবিভূষণ প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। এ ছাড়াও দেশের ও বিদেশের বহু সংস্থা তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

জামশেদজী টাটার নাতি ছিলেন ব্রিটেনের প্রথম কমিউনিষ্ট এম. পি.

সাপুরজি সাকলাতওয়ালা বর্তমানে একটি বিস্মৃত প্রায় নাম। তিনি সদ্য প্রয়াত রতন টাটা বা তাঁর প্রপিতামহ বিখ্যাত জামসেদজি টাটার মতন বিশাল শিল্পপতি ছিলেন না। যদিও জামশেদজি ছিলেন তাঁর মাতামহ। কিন্তু সাপুরজি ছিলেন গ্রেট ব্রিটেন পার্লামেন্টের (হাউস অফ কমন্'স) প্রথম কমিউনিস্ট ও এশিয়ান সদস্য।

১৮৭৪ সালের ২৮ মার্চ সুরাতে এক পার্শী পরিবারে সাপুরজি সাকলাতওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দোরাবজি সাকলাতওয়ালা ছিলেন তুলো ব্যবসায়ী। মা জেরবাই ছিলেন ভারতের দ্রুত উদীয়মান শিল্প সাম্রাজ্যের অধিপতি জামসেদজি টাটার ছোট মেয়ে। পরিবারটি ব্যবসার সূত্রে সুরাত থেকে মুম্বাই (বোম্বাই) চলে আসে। এর কিছুদিন পর সাপুরজির পিতা মাতার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তাঁর মামা তিনিও ছিলেন জামসেদজি, তাঁর কাছে সাপুরজি বড় হতে থাকেন। কলেজিয়েট শিক্ষার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যাওয়ার আগে তিনি বোম্বের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে শিক্ষিত হন।

কিন্তু চাচাতো ভাই দোরাব তাঁর বাবা জামসেদজির চাচাতো ভাই সাপুরজির প্রতি অনুরাগের জন্য সাপুরজিকে ঈর্ষা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত, দোরাব পরিবারে সাপুরজির অংশগ্রহণ সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আশ্চর্যজনকভাবে, সাপুরজিও টাটাদের বা তাদের উপাধি শেয়ার করেন নি। তাঁর নিয়তি তাঁর চাচাতো ভাইদের থেকে ভিন্ন ছিল। ইতিমধ্যে ১৮০০ সালে বোম্বেতে বুবোনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞ সাপুরজিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি দেখেন কিভাবে রোগটি দরিদ্র ও শ্রমজীবীদের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। যখন তাঁর আত্মীয় সহ অভিজাতরা রয়ে গেছে অনেকাংশে নিরাপদ। সেই দিনগুলিতে, সাপুরজি ছিলেন কলেজগামী যুবক। তিনি হাত মেলান ওয়াল্ডেমার হাফকাইনের সাথে। ইনি ছিলেন একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী, যিনি তাঁর দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন জারবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বিপ্লবী অবস্থানের জন্য। হাফকাইনের কাছে ছিল প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি ভ্যাকসিন। যা তৈরিতে তিনি অগ্রগতি অর্জন করেছেন। সাপুরজি দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে বোঝান এই ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য।

এরপর তিনি টাটাদের জন্য ঝাড়খন্ড ও ওড়িশায় লৌহ আকরিক এবং কয়লার মজুদ খুঁজে বের করার জন্য লোহা ও কয়লা প্রদর্শক হিসাবে সংক্ষিপ্তভাবে কাজ করেছিলেন ।তিনি ওখানে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন যার ফলে তিনি ১৯০৫ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান টাটার ম্যানচেস্টার অফিসের সুস্থতা ও পরিচালনার জন্য। পরে তিনি লিঙ্কনস ইনে যোগ দেন , যদিও ব্যারিস্টার হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের আগেই তিনি পড়া ছেড়ে দেন।

রাজনৈতিক জীবন ঃ সাপুরজি সাকলাতওয়ালা একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯০৯ সালে প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি (ILP) তে যোগ দেন। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের নভেম্বর বলশেভিক বিপ্লব ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা। ১৯১৯সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার পর, তিনি সেই সংগঠনের সঙ্গে ILP-কে সংযুক্ত করার জন্য সক্রিয় হন। ILP-এর লেফট উইং গ্রুপ নামে একটি সংগঠিত উপদলের অংশ হিসেবে সাপুরজি এমিল বার্নস, আর. পাম দত্ত , জে. ওয়ালটন নিউবোল্ড , হেলেন ক্রাউফার্ড এবং অন্যান্যদের সাথে যোগ দেন যা এই প্রচেষ্টার জন্য নিবেদিত ছিল। যখন আইএলপি-র বামপন্থী দলের ১৯২১ সালের মার্চের জাতীয় সম্মেলন ব্যর্থ হয়, তখন সাকলাতওয়ালা বামপন্থী গ্রুপের অন্যদের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের নতুন কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিজিবি) তে যোগদানের জন্য সংগঠন ত্যাগ করেন। তিনি ১৯২১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২য় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসে CPGB -র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২২ সালের অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে,

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রথম নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে, তাঁরা ছয়টি আসনে প্রার্থী দেয়। সাপুরজি লন্ডনের ব্যাটারসি উত্তর জেলায় লড়েছিলেন, সাপুরজি সাকলাতওয়ালা উত্তর ব্যাটারসিতে নির্বাচনে জিতেছেন, ১৩১১১ ভোট পেয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২০০০ ভোটের বেশি ভোটে হারান তিনি। এছাড়াও লেবার পার্টির অফিসিয়াল সমর্থন ছাড়াই কমিউনিস্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, জে. ওয়ালটন নিউবোল্ড , মাদারওয়েল থেকে।

সাপুরজি এবং নিউবোল্ডকে যৌথ কার্যকলাপ থেকে বিরত করেনি, এবং এই জুটি বেকারদের দাবি এবং সস্তা আবাসন এবং কম ভাড়ার কারণ যখনই সম্ভব উত্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। ১৯২১ সালের মে মাসে ফরাসিদের রুহর দখলের সময় কার্জন আলটিমেটাম সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে নিউবোল্ডকে হাউস থেকে বরখাস্ত করা হয় ।

১৯২৩ সালের নভেম্বরের নির্বাচনে সিপিজিবি'র ৯ জন সদস্য প্রার্থী হন, যার মধ্যে ব্যাটারসি উত্তরে সাপুরজিও ছিলেন, যেখানে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ব্যাটারসি লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে গৃহীত হন। যদিও সকল কমিউনিস্ট প্রার্থীকে লেবার পার্টি সমর্থন করেনি, যদিও তাঁরা সকলেই স্থানীয় লেবার কর্মীদের সমর্থন চেয়েছিল। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে সমস্ত কমিউনিস্ট প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছিল, ব্যাটারসি নর্থের সাপুরজি সহ।

১৯২৪ সালের সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল তথাকথিত জিনোভিভ চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যাটারসি নর্থে, সাকলাতওয়ালা প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক লেবার পার্টির অনুমোদন ছাড়াই লড়েছিলেন, কিন্তু তারপরও ৫৪৪ ভোটের সামান্য ব্যবধানে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হন, ৮ জন CPGB প্রার্থীর মধ্যে একমাত্র তিনিই নির্বাচিত হন।

১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘটের সময় সাকলাতওয়ালা ধর্মঘটকারী কয়লা খনি শ্রমিকদের সমর্থনে একটি বক্তৃতা দেওয়ার পরে গ্রেপ্তার হন এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দুই মাসের জন্য জেলে ছিলেন। ১৯২৭ সালে গঠিত হওয়ার সময় থেকেই তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগ - এর কাজে সক্রিয় ছিলেন । পার্লামেন্টের সদস্য হবার পর তিনি ভারতে আসেন।কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় ধারণার জন্য মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর রাজনৈতিক মতপার্থক্য হয়। যদিও উভয়েই একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও, দুই ব্যক্তিত্ব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তাদের অভিন্ন লক্ষ্য দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। তা হল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। ভারতে সাকলাতওয়ালার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, তাঁর জন্ম ভূমি ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯২৯ সালে পার্লামেন্টে তাঁর পদ হারালেও তিনি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে অটল ছিলেন।

১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর সাপুরজির সংসদীয় কর্মজীবন কার্যকরভাবে শেষ হয়ে যায় । ১৯৩৪ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন।সেই সফরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলেও সুস্থ হয়ে ওঠেন। ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় সাকলতওয়ালা হ্যারি পোলিট এবং উইলি গ্যালাচারের নির্বাচনী প্রচারণায় সক্রিয় ছিলেন ।

ব্যক্তিগত জীবন ঃ ১৪ আগস্ট ১৯০৭ সালে সাকলাতওয়ালা সারা এলিজাবেথ মার্শ (জন্ম ১৮৮৮)কে বিবাহ করেন। ডার্বিশায়ারে থাকার সময় যখন সারার সঙ্গে সাপুরজির দেখা হয়, তখন তিনি হোটেলের ওয়েট্রেস হিসাবে কাজ করছিলেন। দম্পতির তিনটি পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল।তিনি একবার ওয়েস্টমিনস্টারের ক্যাক্সটন হলে তার সন্তানদের জন্য একটি জরথুস্ট্রিয়ান নবজোট দীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য অ-ধর্মীয় CPGB দ্বারা নিন্দিত হন, যেটি তিনি একটি টাটা পরিবারের ট্রাস্ট তহবিল থেকে সুবিধা নিশ্চিত করার ভিত্তিতে রক্ষা করেছিলেন।

মৃত্যু ঃ ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে সাপুরজি সাকলাতওয়ালা তাঁর লন্ডনের বাড়িতে, ২ সেন্ট অ্যালবানস রোডে, হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১। গোল্ডার্স গ্রিন শ্মশানে তাকে দাহ করা হয়েছিল। তাঁর দেহাবশেষ পরবর্তীতে ২১ জানুয়ারী ওকিং এর ব্রুকউড পার্সি কবরস্থানে তাঁর মায়ের সমাধিতে দাফন করা হয় ।

তাঁর নামে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড ঃ জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের ব্রিটিশ, আইরিশ এবং ডোমিনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি ইংরেজি-ভাষী ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছিল, যার আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হয়েছিল সাপুরজি সাকলাতওয়ালার নামে।